এতা?

এপ্রিল-জুন ২০২০ • সংখ্যা-২১ • বর্ষ-৫

করোনাভাইরাস সংখ্যা

এপ্রিল-জুন ২০২০ • সংখ্যা-২১ • বর্ষ-৫

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রাণেশ চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন
নজরুল ইসলাম

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ : **শাহ আবুল কালাম আজাদ**

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
শাহ আবুল কালাম আজাদ

যোগাযোগ
khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

সম্পাদকীয়

এমএফআই খাতে ২৫ হাজার কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রয়োজন

মানব সভ্যতার জন্যে কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাইরাসটি অতি ক্ষুদ্র এবং অদৃশ্য হলেও এতোই শক্তিশালী যে তার ভয়াল থাবায় বিশ্ব আজ লণ্ডভণ্ড, তটস্থ ও মৃত্যু শঙ্কায় শঙ্কিত। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় ১ কোটি ৯৪ লাখ ৯৭ হাজারের বেশি মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত, যার মধ্যে ৭ লাখ ২৩ হাজার ৮শ' মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। সুস্থও হয়েছেন প্রায় ১ কোটি ১৮ লাখের বেশি। ভাইরাসটির কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়ায় বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল, বাড়ছে আতঙ্ক। তবে দেশে-বিদেশে চেষ্টা চলছে, আশা করা যায় অতি দ্রুতই ভ্যাকসিন আবিষ্কার সম্ভব হবে।

একজন আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি, থুতু ইত্যাদি থেকে নির্গত ড্রপলেটে থাকা ভাইরাসটি অন্যজনের দেহে প্রবেশ করে। এই ড্রপলেট যেখানে পতিত হয় সেখানেও ভাইরাসটি সাধারণত প্রকারভেদে দুই-তিন ঘণ্টা থেকে তিন-চারদিন পর্যন্ত জীবিত থাকে। যেহেতু এই ভাইরাস আক্রান্ত মানব দেহ থেকে সুস্থ দেহে ঢুকে এর সংক্রমণ বিস্তার ঘটায়, সে কারণেই প্রতিরোধের প্রথম উপায় হচ্ছে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা। এ অবস্থায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর প্রতিরোধক হিসেবে মুখে মাস্ক ব্যবহার, ভাইরাসটি চর্বিযুক্ত হওয়ায় সাবান পানিতে বারবার হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির সামাজিক দূরত্ব কমপক্ষে ৩ ফুট রক্ষা করার স্বাস্থ্যবিধি পালনের পরামর্শ দিয়েছে। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বুরো বাংলাদেশসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ব্যাপক প্রচারণা চালালেও বিপুল সংখ্যক মানুষ এ নির্দেশনা না মানায় দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ব্যাপকহারে বাড়ছে। এটি বাস্তব যে, প্রতিরোধ করতে না পারলে এই ছোঁয়াচে ভাইরাস ধ্বংস করে দিতে পারে জনপদ, এমনকী আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী।

ব্যাপকভাবে সংক্রমণ রোধ করতে শক্তভাবে লকডাউন প্রয়োজন। মানুষের জীবন যেমন মূল্যবান– সেই জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে জীবিকারও প্রয়োজন। সরকার, বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠনসহ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা লকডাউন সময়ে কর্মহীন মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বুরো বাংলাদেশ এই দুর্যোগে ৬০ হাজার কর্মহীন অসহায় পরিবারের মধ্যে ৬ কোটি ১৬ লাখ টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে। দেশের বড় ছোট সকল এনজিও ও এমএফআই সমূহও সাধ্যমত নিজ নিজ অবস্থান থেকে ত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে। কিন্তু কোটি কোটি মানুষকে দিনের পর দিন কর্মবিহীন রেখে কোনো সরকার বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই লালন পালন সম্ভব নয় এবং যুক্তিযুক্তও নয়।

অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের অর্থনীতিও করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত। বিশেষ করে দরিদ্র, হত দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত যে সকল মানুষ ব্যাংক ও বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ঋণ সহযোগিতায় নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলো এবং যাদের উন্নয়নে দেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫০ শতাংশে নেমে এসেছিল তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আবার দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাচ্ছে। বিআইডিএস এক গবেষণায় জানিয়েছে যে দেশের প্রায় ১ কোটি ৬৭ লক্ষ লোক চাকরি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুঁজি হারিয়েছে এবং হারাতে বসেছে। এতে দারিদ্র্যের হার ২৫.৫ শতাংশে উন্নীত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জাতীয় প্রবৃদ্ধির হারও বেশ কমে যাবার আশঙ্কা বিরাজমান। এ অবস্থায় আতঙ্কিত হয়ে জীবন-জীবিকা থেকে পালিয়ে গেলে পরিবার, দেশ ও পৃথিবীকে বাঁচানো যাবে না। বরং করোনার বাস্তবতা মেনে নিয়ে মানুষকে সতর্ক ও সচেতনভাবে বর্তমানের 'নিউ এন্ড নর্মাল' জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনাকে দূরে রেখে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে।

জেলা পর্যায়ে কাজ করা ৯০ শতাংশ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সম্পদেও অপ্রতুলতা আছে, ফলে তারা আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে। ৫৪ শতাংশ এনজিও'র নিজস্ব উপার্জনের উৎস আছে যার ৫০ শতাংশই আসে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে। করোনার কারণে তাদেরও স্বাভাবিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে।

আমরা মনে করি, সরকারের উচিত দরিদ্র ও হত দরিদ্রদের উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে এমএফআই খাতকে অন্ততপক্ষে ২৫ হাজার কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন ঋণ প্রদান করা। এতে কৃষক ও ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে এবং পূর্বের ন্যায় দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ ব্যাপক আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত থাকবে। ফলে, বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্থনীতির চাকা করোনাকালীন শুধু স্থিতিশীল নয়, বরং গতিশীল হবে এবং দেশের উন্নয়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন অনেক চিকিৎসক, নার্স, পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মী। পেশাগত ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নিতে গিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বুরো বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার অনেক কর্মী। আমরা তাদের আত্মার শান্তি ও পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

কোভিড-১৯: আতঙ্ক নয়, জয় করতে হবে সচেতনতা দিয়ে

জাকির হোসেন

২০১৯ এর শেষার্ধে চীনে উদ্ভব হওয়া নোভেল করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ চলতি বছরের প্রথমার্ধে মহামারি রূপে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। বাংলাদেশে এই রোগটি শনাক্ত হয় মার্চে। কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা আতঙ্কিত করে তুলেছে পুরো বিশ্বকে। মারাত্মক ছোয়াচে এই রোগের প্রকোপে একদিকে বাড়ছে মৃত্যু, অন্যদিকে স্থবির হয়ে পড়ছে অর্থনীতি। অর্থ ও প্রযুক্তির দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে অবস্থানকারী রাষ্ট্রগুলোও কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতায় হয়ে পড়েছে দিশেহারা। এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রায় ১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৯৭ হাজারের বেশি মানুষ এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত, যার মধ্যে মৃত্যু ঘটেছে ৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৮শ' জনের। মৃত্যুহার বিশ্বের সবচেয়ে সম্পাদশালী এবং ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকাতেই বেশি। এখানে প্রায় ১ লাখ ৬২ হাজার ৩শ' মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। জানা যায়, এ মুহূর্তে আক্রান্তের দিক থেকে বাংলাদেশ ১৫তম স্থানে যা আমাদের জন্যে সত্যিই আতঙ্কের। তবে আশার কথা করোনা আক্রান্ত হলেই কেউ মারা যাবে– তা নয়। বিশ্বে ইতোমধ্যে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ২৪ হাজার জন আক্রান্ত মানুষ সুস্থ হয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে মানুষ থেকে মানুষে। আক্রান্ত ব্যক্তির স্পর্শ, বিশেষ করে হাতের মাধ্যমে এবং থুতু ও হাঁচি-কাশির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। বিষয়টি এমন যে, আক্রান্ত ব্যক্তি যা কিছু স্পর্শ করবেন একজন সুস্থ ব্যক্তি তা স্পর্শ করলে তিনিও আক্রান্ত হবেন। অর্থাৎ এই সংক্রমণের অধিকাংশই প্রথমে হাতের মাধ্যমে একজন থেকে আরেক জনের কাছে আসে। এছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারাও ঘটে সংক্রমণ। এক অদৃশ্য ভয়াবহ দানব এই করোনাভাইরাস।

তবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার উপায় হিসেবে বেশ কিছু নিয়মাবলী বা স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বলা হচ্ছে, সাবান ও হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড হাত ধুলে এই ভাইরাসটি হাত থেকেই মারা যায়। হাতে স্যানিটাইজার ব্যবহার করেও এই ভাইরাস প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু স্যানিটাইজার ব্যবহার কিংবা হাত ধোয়ার আগেই যদি কেউ নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ করে তবে তা ফুসফুসে ঢুকে সংক্রমণ ঘটাবে। এ জন্যেই ঘন ঘন সাবান-পানিতে হাত ধোয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কেউ সংক্রমিত হলে তার ক্ষেত্রে কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎসকের ব্যবস্থাদি মেনে চলা অবশ্য প্রয়োজন যাতে সংক্রমণ না ছড়ায়। এই 'আইসোলেশন' ও 'কোয়ারেন্টিন' শব্দ দু'টি এখন গ্রামের নিরক্ষর মানুষেরও অতি চেনা।

চীনের উহানে ২০১৯ এর নভেম্বরে যখন 'করোনা' ধরা পড়ে তখন প্রাথমিকভাবে তা খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। পরে চীন সরকার এই মহামারির ভয়াবহতা টের পেয়ে উহানকে লকডাউন করে। কিন্তু ততোদিনে এই ভাইরাস শুধু চীনেই নয় আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ইতালি, ইরান ও সৌদি আরবসহ বিশ্বের অনেক দেশেই ছড়িয়ে পড়ে।

এক পর্যায়ে বাংলাদেশেও করোনার সংক্রমণ দেখা দেয়। বলা হচ্ছে, প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে ফেরার মাধ্যমে এই ভাইরাস সাথে নিয়ে এসেছেন। বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই। রোগ তো আর আপন-পর চেনে না। দেশে ফেরত প্রবাসীদের জন্যে কোয়ারেন্টিন ও

আইসোলেশনের ব্যবস্থা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তারা তা মানেননি বা মানানো যায়নি। এটা এয়ারপোর্টে নামার সাথে সাথেই করা উচিত ছিল, কিন্তু তার শতভাগ বাস্তবায়ন ঘটেনি। আবার এই প্রবাসী স্বজনরা নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী ১৪ দিন আইসোলেশনে থাকেননি, এদের কেউ সচেনতার অভাবে আবার কেউ জেনে-বুঝে প্রভাব খাটিয়েও বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাড়ির আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী এবং হাটবাজারে গিয়ে অসংখ্য মানুষকে তারা সংক্রমিত করেছেন। এভাবেই সবার অজান্তেই দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন। সরকার কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা অনুধাবন করে ২৬ মার্চ থেকে দেশে অফিস-আদালতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে এবং প্রত্যেককেই স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে অর্থাৎ অন্যের থেকে কমপক্ষে তিন ফুট দূরে অবস্থান করে, মুখে মাস্ক ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনে হাতে গ্লাভস ব্যবহার করে জীবনযাপনের নির্দেশনা প্রদান করে। একই সাথে আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ি ও মহল্লা লকডাউনের আওতায় আনা হয়। এক পর্যায়ে শহরে শহরে, জেলায় জেলায় 'লকডাউন' ঘোষণা করা হয়। পরিবারের আক্রান্ত সদস্যদের বাড়িতেই আইসোলেশনসহ করোনা রোগীদের জন্যে হাসপাতালগুলোতেও আইসোলেশনের ব্যবস্থা নেয়া হতে থাকে।

দীর্ঘ ৬৭ দিন সাধারণ ছুটি ও লকডাউন ঘোষিত হলেও অসংখ্য মানুষ নির্দেশনা না মেনে ঘরের বাইরে গিয়েছেন, বাজারঘাটসহ রাস্তাঘাটেও চলাচল করেছেন। বাস, ট্রেন, লঞ্চসহ সব ধরনের গণপরিবহন বন্ধ থাকলেও অনেক মানুষ বিকল্পভবে ট্রাকে, ভ্যানে, রিক্সায় ও হেঁটে ঢাকা থেকে দূর দূরান্তে পাড়ি জমিয়েছেন। এসব যানবাহনে স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্ব মানা হয়নি। বিশেষ করে ফেরি পারাপারে গাদাগাদি করে অবস্থান করতে দেখা গেছে। ফলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে দেশব্যাপী। অর্থাৎ বিষয়টি এমন হয়েছে যে, কিছু মানুষ লকডাউন মানলেও অধিকাংশই মানেননি কিংবা বলা যায় তদের মানানো যায়নি। এতে করে অদৃশ্য করোনা ভাইরাস অসংখ্য মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হলেও আমরা তা টের পাইনি। এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় ঘটেছে। (এক) সরকারিভাবে ও বেসরকারি খাতের অনেক প্রতিষ্ঠান সকলকে নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, সাবান পানিতে হাত ধোয়া ও মাস্ক-গ্লাভস ব্যবহারের জন্যে বারবার সতর্ক করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা মানা হয়নি। (দুই) লকডাউন ঠিক লকডাউনের মতো কার্যকর হয়নি। অফিস আদালত বন্ধ রাখা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রাস্তাঘাট, দোকানপাট ও বাজার খোলা থাকায় ব্যক্তি পর্যায়ে নিরাপদ দূরত্ব নিশ্চিত হয়নি। ফলে বৃদ্ধি পেতে থাকে কোভিড-১৯ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই যখন অবস্থা তখন আমাদের কি করা উচিত? কারণ, মানুষকে যদি দিনের পর দিন এরকম ঢিমেতাল লকডাউনে রেখে অফিস-আদালত-কারখানা বন্ধ রাখা হয় তাহলে শুধু মানুষই কর্মহীন হয়ে পড়বে না, দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে মারাত্মক ধস নামবে। ইতোমধ্যে তা দৃশ্যমান হতেও শুরু করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের জানা। সম্প্রতি আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছি এবং উন্নত অর্থনীতির সড়কে যাবার চেষ্টা করছি। এই উন্নয়নের পেছনে ক্ষুদ্র ও এসএমই ঋণসহ গার্মেন্টস খাত ও রেমিটেন্স এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এনজিও ও এমএফআই খাতের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ উৎপাদন অর্থনীতিতে প্রায় ৩ কোটি দরিদ্র মানুষের মাঝে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। তিন কোটি পরিবার অর্থাৎ প্রায় ১২ কোটি মানুষ এই ক্ষুদ্র ঋণ দ্বারা উপকৃত। এর ফলে দারিদ্র্যের হার ৪৪ শতাংশ থেকে প্রায় ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে কোটি কোটি মানুষ এই ঋণ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হবার সুবাদে একদিকে যেমন ব্যাপক আত্মকর্মসংস্থানসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি দেশজ উৎপাদনও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অর্জন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, এনজিওদের ঋণে দেশে উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় আর সাহায্য বা দানের অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই দরিদ্রদের কর্মবিমুখ করে তোলে।

করোনার মরণাঘাতে পৃথিবীর দেশে দেশে একদিকে যেমন মৃত্যু আতঙ্ক বিরাজ করছে তেমনই জীবিকার অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয়টিও প্রাধান্য পাচ্ছে। 'জীবন-জীবিকা' এই পরিপূরক শব্দ দুটির দূরত্ব দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য যেমন নিরাপদে ঘরে থাকা প্রয়োজন, তেমনি জীবিকার জন্য প্রয়োজন ঘরের বাইরে যাওয়া। অবশ্য এখন উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসেও কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের মতো উন্নয়ন প্রত্যাশী অর্থনীতি ততোটা স্থিতিশীল হয়ে ওঠেনি; তদুপরি মাসের পর মাস লকডাউনের বেড়াজালে সেই অর্থনীতি ধ্বংস হতে চলেছে। অনেকেই মনে করেন, সাধারণ ছুটি দিয়ে মাসের পর মাস ঘরবন্দী করে চাকরি, জমানো টাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করে বাড়িওয়ালার ভাড়ার চাপ নিয়ে লাখ লাখ মানুষ মারাত্মক সমস্যার মধ্যে পড়েছে। অন্যদিকে মানুষের মধ্যে ছোঁয়াচে মহামারী করোনায় মৃত্যুর আশঙ্কাও বিরাজ করছে।

পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই দীর্ঘ সময় তার নাগরিকদের বসিয়ে খাওয়ানো সম্ভব নয়– বেসরকারি খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও তার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন দেয়া সম্ভব নয়, আর শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের পক্ষেও সম্ভব নয় কারখানা বন্ধ রেখে শ্রমিকদের বেতন দেয়া। স্বাভাবিকভাবেই করোনা আক্রান্ত

পৃথিবীকে করোনার বাস্তবতা মেনে নিয়েই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার আয়োজন করতে হবে।

এ জন্যে প্রথমেই যে বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া দরকার তা হচ্ছে করোনা নিয়ে আতঙ্কিত বা ভীত হওয়া নয়, প্রয়োজন ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি ও সতর্কতা অবলম্বন। সচেতনতার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেদেরকেই করোনামুক্ত থাকার উদ্যোগ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে শুধু করোনাই ঘাতক রোগ নয়, আরও অনেক ঘাতক ব্যাধি রয়েছে। জানা যায় বিজ্ঞানীরা এই গোত্রের প্রথম ভাইরাস আবিষ্কার করেছিলেন ১৯৬৫ সালে। এরপর MERS-CoV এবং SARS-CoV ভাইরাসও মানবকূলে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। ২০১২ সালে মার্স ভাইরাসে সৌদিতে প্রায় ৯০০ লোকের মৃত্যু ঘটে। বাংলাদেশী যারা সৌদিতে এই ভাইরাসে মারা গিয়েছিলেন তাদের লাশ খুব প্রটেকটিভ ভাবে দেশে পাঠানো হয় এবং খুব সতর্কতার সাথে কবরস্থ করা হয়।

আগেই বলেছি, নভেল করোনা ভাইরাসটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সংক্রমণ ঘটায় এবং এ জন্যই এতে যেমন ব্যাপক সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে, তেমনি ব্যক্তি নিজে সতর্ক ও সচেতন হলে সংক্রমণের এই আশঙ্কা শূন্যে নামিয়ে আনা কঠিন কিছু নয়। এখানে প্রত্যেকেই যদি সচেতন ও সতর্ক থাকতে পারি এবং স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহলে সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এটা ঠিক– একথা বলা সহজ কিন্তু কার্যকর করা বেশ কঠিন। তারপরও আমাদেরকে সেভাবেই সতর্ক হতে হবে।

লক্ষ্যণীয় যে, অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন ও ব্যক্তি পর্যায়ে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগী মানুষ সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সংবাদ মাধ্যম, লিফলেট এবং মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানো অব্যাহত রেখেছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু তারপরও অনেক মানুষ স্বাস্থ্য বিধি না মেনে করোনা সংক্রমণের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছেন। তাদেরকে আরো সচেতন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে পরিপূর্ণভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়নকর্মীদেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মানুষকে বাঁচতে হবে এবং কাজও করতে হবে। বাঁচার জন্যেই সতর্কতা অবলম্বন ও স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে। আর কর্মক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিরাপত্তার মোড়কে কর্মীদের সুরক্ষা দিতে হবে।

“করোনা নিয়ে আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন কার্যকর সচেতনতা ও এই ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মানা। স্বাস্থ্যবিধি মানা খুব কঠিন কিছু না। করোনার মতো নতুন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর চেয়ে বরং সাবান পানিতে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার, মুখে মাস্ক ব্যবহার, অন্যের সাথে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা, গণপরিবহন বা ভিড় এড়িয়ে চলা অনেক সহজ।”

একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন এইডস, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ইত্যাদি নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেলেও মানুষ স্বাভাবিক গতিধারায় চলছে। মহামারি করোনাকেও স্বাভাবিক রোগ হিসেবে মেনে নিয়ে পৃথিবীর মানুষকে তা সচেতনতার মাধ্যমেই প্রতিরোধ করতে হবে।

আমার মূল কথা হচ্ছে, করোনা নিয়ে আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন কার্যকর সচেতনতা ও এই ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মানা। স্বাস্থ্যবিধি মানা খুব কঠিন কিছু না। করোনার মতো নতুন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর চেয়ে বরং সাবান পানিতে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার, মুখে মাস্ক ব্যবহার, অন্যের সাথে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা, গণপরিবহন বা ভিড় এড়িয়ে চলা অনেক সহজ। প্রাথমিকভাবে করোনার উপসর্গ দেখা গেলে ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে প্রচলিত ওষুধের ব্যবহার, গরম পানির ভাপ নেয়া, লেবু চা এবং পর্যাপ্ত ভিটামিন সি গ্রহণের মাধ্যমেও করোনাকে নিরাময় করা যায়। এতে মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে আসবে। আমি মনে করি, একটু সতর্ক হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মানলেই যে ভাইরাস প্রতিরোধ করা যায় সে ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবারও কিছু নেই। পেশাগত প্রয়োজনে যারা বের হবেন তাদের মাস্ক এবং অন্যান্য সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। সেই সাথে আমাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে হবে। নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেয়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্থাৎ ইমিউনিটি বাড়াতে হবে। নিয়ম মেনে ব্যায়াম করতে হবে। আমার বিশ্বাস, এভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা অবশ্যই করোনাকে জয় করতে সক্ষম হবো। এ পৃথিবী আবার ফিরে পাবে আতঙ্কহীন স্বাভাবিক রূপ।■

● নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ

কোভিড-১৯ ও আমাদের কৃষি অর্থনীতি

এম. মোশাররফ হোসেন

অতিশয় ক্ষুদ্র একটি বস্তুও যে বিশ্বকে এক কাতারে সামিল করতে পারে তার চাক্ষুস প্রমাণ করোনাভাইরাস। কোভিড-১৯ আমাদের দিবালোকের মত সত্য হিসেবে জানিয়ে দিচ্ছে, করোনাভাইরাস শুধুমাত্র ঝুঁকি নয় বরং পুরো মানব সমাজকে ঠেলে দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তার দিকে। কারণ, শুধু যদি ঝুঁকি হতো তাহলে আমরা ঝুঁকির বিভিন্ন দিক পরিমাপ করতে পারতাম এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতো। কিন্তু অনিশ্চয়তা তো মাপজোক করা যায় না। অনিশ্চয়তাকে মোকাবেলা করার বিজ্ঞানসম্মত পথ-পদ্ধতি নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তাই অনিশ্চয়তার এক বা একাধিক গল্প-চিত্র নির্মাণ করে প্রতিটির বিপরীতে সম্ভাব্য সমাধান চিত্র অংকন করতে হবে। তা সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক যে কোন ক্ষেত্রেই হোক। বিশেষত গুরুত্ব দিতে হবে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সমাধানের দিকে।

মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য একটা সিস্টেম থাকে যাকে বলা হয় ইমিউন সিস্টেম। এই সিস্টেমকে তুলনা করা যায় শরীরের পাহাড়াদার হিসেবে যাতে করে তারা শরীরের মধ্যে কোনো শত্রু প্রবেশ করলে তাকে সমূলে উৎপাটন করতে পারে। কিন্তু করোনাভাইরাস এমন চৌকষ শত্রু যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে তার সংখ্যা বাড়াতে থাকে। ফলে ইমিউন সিস্টেম সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না এবং শরীরের মধ্যে নানাবিধ উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি করে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বন্ধ হয়েছে সব ধরনের ট্রান্সপোর্ট, অনানুষ্ঠানিক খাত–রিক্সা, ভ্যানসহ শহর-উপশহর-গ্রামের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বা জীবিকা নির্বাহ কর্মকাণ্ড। বেকারত্ব বাড়ছে এবং বাড়বে সর্বত্র। কৃষক কৃষিজ ফসল বিক্রির জন্য হাটবাজারে যেতে পারছে না কারণ, হাট বসতে দেয়া হচ্ছে না। এ সবই বড় ধরনের অনিশ্চয়তা এবং এ অনিশ্চয়তা কতদিন চলবে তা কেউ জানে না। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রধান হাতিয়ার হবে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করা।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় বিশ্বব্যাপী খাদ্যনিরাপত্তা চরম ঝুঁকির মুখে পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ ঝুঁকছে অতিরিক্ত খাদ্য ক্রয়ে। অপর দিকে নিজ দেশের জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করার তাগিদে খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি বন্ধ করার পরিকল্পনা আটছে বিভিন্ন দেশ। আবার অন্যদিকে কিছু দেশ খাদ্যসামগ্রীর বাড়তি আমদানির দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমাদের দেশকে চৌকষ কৌশলী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সরকার যথার্থভাবে এক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আর তা হলো 'কৃষি নির্ভর জাতীয় অর্থনীতি'। সরকার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশে আবাদযোগ্য জমির পাশাপাশি পতিত জমিগুলো চাষাবাদের উপযোগী করে ধান ও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি অগ্রাধিকার প্রদান করতে। দেশে পতিত জমির পরিমাণ প্রায় ১১ কোটি একর। পতিত এই জমিগুলো ব্যবহারযোগ্য করে তোলাই বর্তমান সময়ের প্রধান কাজ। বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি হিসেবে পড়ে থাকবে না–প্রধানমন্ত্রী এরূপ নির্দেশনা দিয়েছেন। পতিত জমিগুলো চাষাবাদের জন্য সরকারকে প্রণোদনা প্রদান করতে হবে। যাতে পতিত জমিতে খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনে সংশ্লিষ্টরা উৎসাহিত হন।

আগামীর বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে কৃষি খাতে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর উপর। সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে হবে। জমিগুলোকে উৎপাদনশীল রাখার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে। ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের

মাঝে দ্রুত ঋণ পৌঁছানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি বছর কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য একটি বাজেট ঘোষণা করে প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাংককে তা বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রাম পর্যায়ের শাখা নেই তারা NGO-MFI এর মাধ্যমে সমন্বয় (Linkage) সাধন করে তা বাস্তবায়ন করে থাকে। গত অর্থ বছরে NGO-MFI-এর মাধ্যমে মোট বাজেটের ৩৫% ঋণ বিতরণ করা হয়েছে কৃষকদের মাঝে। NGO-MFI দের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের আদায়ের হার প্রায় শতভাগ।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO) ঋণগ্রহীতার দোরগোড়ায় ঋণের অর্থ পৌঁছে দেয়। প্রাথমিক দল গঠন, ঋণের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং সপ্তাহভিত্তিক ঋণ সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় গ্রহীতা পরিবারের নানাবিধ সামাজিক তথ্যাদির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক

দুর্যোগ এলে গ্রাহকদের পাশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নিয়ে দাঁড়ানোর দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রাখতে হয় বিধায় তখন কোনো আয় হয় না, অধিকন্তু ব্যয় যথারীতি চলতে থাকে।

এছাড়াও ঋণ গ্রহীতার জীবনমান উন্নয়নের জন্য অর্থাৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO) তার গ্রাহকদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ, দক্ষতা উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রচলিত সাধারণ আইন, জেন্ডার ইস্যু, শিক্ষা ও গণশিক্ষা প্রভৃতি কর্মসূচির উপর নিয়মিত মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই সকল সামাজিক সেবা

বাণিজ্যিক ব্যাংক করতে পারে না। কারণ তাদের সাংগঠনিক কাঠামো এভাবে তৈরি করা হয় নাই। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO) কেবল গ্রাহকদের 'ঋণ'-ই প্রদান করে না, ঋণ ব্যবহার সরেজমিনে নিবিড় পর্যবেক্ষণসহ নানাবিধ কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে। এর ফলে গ্রাহকগণ ঋণ ব্যবহারে সফলতা লাভ করে এবং আয় বৃদ্ধি পায় এবং সাথে সাথে ঋণ ব্যবহারের সক্ষমতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মূলত গ্রাহকদের ঋণ ব্যবহারের সফলতাই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রধান শক্তি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঋণ ব্যবহারের সফলতার কারণে গ্রাহকদের আয়ও বহুগুণ বেশি হয়। ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহকদের ঋণ সঠিক পন্থায় ব্যবহারের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে সরকারের সম্প্রসারিত কর্মসূচি যথা– কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য সহযোগিতা করে। গ্রাহকদের ঋণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সাথে সাথে পারিবারিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ঋণগ্রহীতার আয় বৃদ্ধি পায় এবং পরিবারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এজন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গড় ঋণ আদায়ের হার ৯৭%।

বাংলাদেশ ব্যাংকের করণীয় হবে Bank NGO/MFI Linkage কর্মসূচিকে জোরদার করা এবং এই পদ্ধতিতে ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়ে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কৃষিখাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আগামী ২০২০-২১ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক যে বাজেট নির্ধারণ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণ করবে, সে বাজেটের ৫০% অর্থ Bank-NGO/MFI Linkage এর মাধ্যমে বিতরণ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেয়া প্রয়োজন। এটা করতে পারলে খুব সহজেই কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিতসহ এর ব্যবহারও নিশ্চিত করা যাবে। জীবন ও জীবিকা বাঁচানোর অর্থনীতিতে এটাই হবে সর্বোত্তম পথ।

ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীকে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ সহায়তা সেবা দেয়ার জন্য যারা দক্ষ ব্যাংকিং মেকানিজম তৈরি করার জন্য পরামর্শ দেন তাঁদের ভাবনায় পরিবর্তন আনতে হবে। চাষীদের কাছে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ পৌঁছে দেয়ার জন্য সারাদেশে রয়েছে NGO-MFI-এর প্রায় ১২,৫০০ শাখা, ৩ লক্ষ নিরলস কর্মী যারা প্রতিদিন এই কাজগুলো দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে করছে।

অর্থনৈতিক মন্দায় যে ঘটনাটি ঘটে তা হলো 'চাহিদার পতন'। এ সময় মানুষ কাজ হারায়। মানুষের কাজ না থাকলে আয় থাকে না; আয় না থাকলে ক্রয়ক্ষমতা নেই, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা নেই। উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা না থাকলে উৎপাদনকারী উৎপাদন হ্রাস করে শ্রমিক ছাটাই করেন। ফলে সমাজে কাজ হারানো মানুষের সংখ্যা যতো বৃদ্ধি পায়, ততোই চাহিদা কমে যায়। এভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে।

এ চক্র থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো 'চাহিদা সৃষ্টি'। একমাত্র সরকারই পারে চাহিদা সৃষ্টি করতে। সরকার তার বাজেট থেকে নানাবিধ কার্যক্রম যথা– ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গতিশীল করে খরচ বৃদ্ধি করতে পারে। এতে গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের আয় বাড়বে। গ্রামের মানুষের আয় বৃদ্ধির ফলে শহরে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের চাহিদা গ্রামে সৃষ্টি হবে। গরীব মানুষ তারাই যারা তাদের আয় পুরোটাই খরচ করেন। এ কারণে গরীবরাই হচ্ছে উন্নয়নের চাবিকাঠি। কারণ, ধনী মানুষের আয় বাড়লে চাহিদা আগের মতোই থেকে যায়, বাড়ে না। অন্যদিকে গরীব মানুষের আয় বাড়লে চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন বেড়ে যায়। ক্ষুদ্র ঋণ সেক্টরে গরিব মানুষকে ঋণ দিয়ে NGO-MFI-রা বহুগুণ চাহিদা বৃদ্ধি ঘটায়।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে NGO-MFI মিলে বছরে ১ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে; যা জাতীয় বাজেটের ২৮% এবং মোট দেশজ উৎপাদনের ৫%। NGO-MFI-দের এই বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে সহস্র গুণ চাহিদা সৃষ্টি করে ফলে উৎপাদনকারীরা পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে আগ্রহী হয় অর্থাৎ চাহিদার সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ জনপদে NGO-MFI-দের কার্যক্রম সু-বিস্তৃত বিধায় এবং সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা বিদ্যমান থাকায় বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি তথা গ্রামীণ অর্থনীতি আজ শক্ত ও মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর পাটাতন অত্যন্ত মজবুত। যে কোনো বড় ধরনের

ধাক্কা মোকাবেলা করার সক্ষমতা এই অর্থনীতি অর্জন করেছে। এই অর্থনীতিকে ধরে রাখতে পারলে কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনীতির মন্দা বাংলাদেশকে কাবু করতে পারবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিচক্ষণতার সাথে অর্থনৈতিক বিভিন্ন খাতের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন এবং ইতোমধ্যে ক্ষুদ্রঋণ খাতসহ (NGO) অন্যান্য খাত মিলে ৭০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের গ্রহণযোগ্য নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তা সর্বমহলে অভিনন্দিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল থেকে ৩,০০০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য বরাদ্দ করেছে। এই প্যাকেজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– (ক) সকল সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (NGO) এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ঋণ সহায়তা প্রদান করতে পারবে, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক এই প্যাকেজে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ১% সুদে অর্থ গ্রহণ করে তা ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিতরণ করতে পারবে। অর্থনৈতিক ইতিহাসে প্রান্তিক পর্যায়ের গ্রাহকদের চরম ক্রান্তিকাল চলছে। এই মুহূর্তে প্রয়োজন সঠিক জায়গায় অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা। এই প্রণোদনা প্যাকেজ সেই লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে। বিচক্ষণতার সাথে CDF, MRA এবং বাংলাদেশ ব্যাংক জটিল এবং দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অভিনন্দিত হয়েছে। এই নীতিমালা প্রণয়নে নিজে যুক্ত থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছি। নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে প্রয়োজনে তহবিলের পরিমাণ বর্ধিত করা হবে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিল চাহিদার অভাব পূর্ণ হবে এটা আশা করা যায়।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি খাতে ব্যবহারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৫,০০০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ নীতিমালাও ঘোষণা করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের চলতি বছরের কৃষি ঋণ বাজেট বহির্ভূত। এই প্যাকেজ থেকে কৃষকরা ৪% সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে সরাসরি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে। এখানে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অংশ করা হয়নি। অথচ গ্রামীণ অর্থনীতির হিসাবে দেখা গেছে ৮০% অর্থ সরবরাহ করে NGO বা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ। সময় এসেছে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে মূলধারায় যুক্ত করার।

বাংলাদেশের অর্থনীতি হচ্ছে কৃষি অর্থনীতি। যখন আধুনিকায়নের ছাপ লাগেনি অর্থাৎ কল-কারখানা গড়ে ওঠেনি তখন কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে বাংলাদেশের মানুষ তাদের জীবন নির্বাহ করেছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে বিপর্যস্ত সমাজকে আবারো ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কৃষি অর্থনীতিই হবে মূল চালিকা শক্তি এবং এই চালিকা শক্তির মূলধারায় নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ (NGO-MFI)। এই জন্য বলা যায় বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রাকৃতিক অর্থনীতি। কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনীতিকে পুনরায় স্বমহিমায় আনতে হলে বিলাসদ্রব্য আমদানি কিছু সময়ের জন্য পরিত্যাগ করতে হবে।

ধনী রাষ্ট্রগুলোতো বটেই, এমনকি তাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চলা নিম্ন ও মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রগুলোও বিগত কয়েক দশকে সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতা ও গোয়েন্দা নজরদারিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি রাষ্ট্রেরই সামরিক খাতে ব্যয় করার প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু সেই ব্যয় যদি প্রয়োজনকে ছাপিয়ে উচ্চাভিলাষের দিকে ধাবিত হয় তবে তা জনগণের কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বিশ্বের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী যেখানে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও রোগব্যাধির সাথে লড়াই করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয় নিষ্ফলা বিনিয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। করোনাভাইরাসজনিত বৈশ্বিক মহামারি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থতাই এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। অথচ বিশ্বের পরাশক্তি ও উন্নত দেশসমূহ যদি এই ব্যয়ের সামান্য পরিমাণ মানব কল্যাণে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক খাতে বিনিয়োগ করতো তবে আজকের এই বৈশ্বিক সংকটে আমাদের এতোটা নাস্তানাবুদ হতে হতো না। করোনাভাইরাসের মত অতিক্ষুদ্র একটি জীবাণু সামরিক খাতে রাষ্ট্রগুলোর বিপুল ব্যয়ের ফলাফলকে অর্থহীন ও শূন্যে পরিণত করেছে।

কৃষিভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতির উপর নির্ভর করে এক সময় বাংলাদেশ ছিল সম্পদ ও প্রাচুর্যে ভরপুর। যুগের পর যুগ কৃষিখাতই ছিল আমাদের প্রধান উপজীব্য। বিভিন্ন সময়ে কৃষকের উপর হয়েছে অত্যাচার-নির্যাতন, তাদেরকে করা হয়েছে বঞ্চিত কিন্তু কৃষক সমাজ মানুষের সাথে কখনও বেঈমানী করেনি। তাঁরা সঠিক সময়ে ফসল উৎপাদন করেছে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে এদেশে অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে। এতে কিছু দাবি হয়তো আদায় হয়েছে। সরকার কৃষকদের জন্য গত একযুগ ধরে সম্ভাব্য সকল কিছুই করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুণ্ঠন, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদি প্রতিকূলতা অতিক্রম করে কৃষক মানুষের জন্য ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করেছে।

করোনাভাইরাস বিশ্ববাসীকে নতুন ধরনের যুদ্ধে নিমজ্জিত করেছে, আর তা হলো খাদ্য নিরাপত্তার যুদ্ধ। প্রতিটি দেশ নিজ নিজ জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টির জন্য প্রাণান্ত যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। এ যুদ্ধে সকলকেই জয়লাভ করতে হবে। তা না হলে জীবন ও জীবিকা উভয়ই ভয়াবহ সংকটে পড়বে। এ সংকট উত্তরণই বর্তমান সময়ে একমাত্র চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে থাকবে এবং আছে। বিগত একযুগে কৃষিখাতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে তা এখন আরো সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে জনগণের সামনে। অর্থসম্পদ আছে কিন্তু ঘরে খাবার নেই এ পরিস্থিতি যাতে না হয় সেজন্য আমাদের সকলের প্রচেষ্টা চিরন্তন হতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে সংকট/দুর্যোগ মোকাবেলা করার দীর্ঘ ইতিহাস। মানুষের রয়েছে অজেয় প্রাণশক্তি। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সকলের পূর্ণ সহযোগিতায় আবারো ঘুরে দাঁড়াবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস ■

● লেখক: অর্থ পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ

বুরো বাংলাদেশ-এর মাধ্যমে আদা চাষীদের ঋণ দিচ্ছে রূপালী ব্যাংক লি.

ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ
এমডি অ্যান্ড সিইও, রূপালী ব্যাংক লি.

সময়ের আলোকিত, উদ্যমী ও সৃজনশীল ব্যাংকার ব্যক্তিত্ব ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ বর্তমানে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অন্যতম ব্যাংক রূপালী ব্যাংক লি. এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও। এর আগে তিনি সোনালী ব্যাংক লি. এর সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। ব্যাংকিং খাতের শীর্ষ ব্যাংকারদের একজন ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ তার কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন তিনি দক্ষ, অভিজ্ঞ, মেধাবী ও প্রাজ্ঞ ব্যাংকার।

দূরদর্শী ও সৃজনশীল ব্যাংকার মো. ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ এর জন্ম ১৯৬০ সালের ১০ ডিসেম্বর ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার ছোটরাজপাড়া গ্রামের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ ১৯৭৬ সালে নবাবগঞ্জ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগসহ মেধা তালিকায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য শাখায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৯৭৮ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে বিকম (সম্মান) ম্যানেজমেন্ট শাখায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৩ সালের ৩০ মে তিনি দেশের রাষ্ট্র খাতের অন্যতম ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে ফিন্যান্সে এমবিএ করেন।

সম্প্রতি করোনাকালীন ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিয়ে প্রত্যয় সম্পাদকের সাথে কথা হয় এই অভিজ্ঞ ব্যাংকারের। দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিয়ে তিনি যা বলেন তা এখানে তুলে ধরা হলো:

প্রত্যয়: করোনায় বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী জনজীবনই শুধু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়নি, জীবন-জীবিকা বিশেষ করে অর্থনৈতিক কার্যক্রমও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ থেকে উত্তরণে কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ : পূর্বেও পৃথিবীতে দুর্যোগ-মহামারী এসেছে কিন্তু কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের এই মহামারী বিশ্বকে মৃত্যু আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বিশ্বের দেশে দেশে লক ডাউনের ফলে অর্থনীতির চাকাও স্থবিরতার শিকার। দু'দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বেশ গতিশীল হয়েছিল এবং প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৮%-এ পৌঁছে গিয়েছিল। আমরা স্বল্পোন্নত অর্থনীতি থেকে উন্নয়ন ঘটিয়ে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের শিক্ষা খাত ও কৃষি খাত উভয় ক্ষেত্রেই আশানুরূপ সাফল্য এসেছে। যখন দেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী আঘাত হেনেছে। উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি মন্দার কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয়ে নেতিবাক প্রভাবসহ দেশের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হার বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতির চটজলদি কোনো সমাধান নেই। সেক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে একটি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।

করোনার আঘাতে বিশ্বের সব দেশে আর্থিক কর্মকাণ্ড প্রায় স্থবির। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যাংকিং খাতসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। একই সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী মাইক্রো ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) খাতও বেশ ক্ষতির শিকার হচ্ছে।

আমি মনে করি এই মারাত্মক সংকট কাটাতে দেশের কৃষিখাত বড় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। কারণ, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রায় সবগুলো খাত কমবেশি বন্ধ বা স্থবিরতার মধ্যে পড়লেও কৃষি খাতের উৎপাদন বন্ধ হয়নি। বিপণনের ক্ষেত্রে কিছুটা সংকট সৃষ্টি হলেও তা অনেকটা কেটে গেছে। ব্যাংকিং সেক্টরের অনেকেই কৃষি খাতকে গুরুত্ব দিচ্ছি। রূপালী ব্যাংক এ ব্যাপারে তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রত্যয় : কৃষি খাতের প্রধান সমস্যা হচ্ছে বিপণন। স্বাভাবিক সময়েও উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য থেকে স্থানীয় পর্যায়ের কৃষকরা বঞ্চিত হন। সে ক্ষেত্রে করোনাকালে সংকট আরো বেশি– আপনার পরামর্শ কি?

ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ : আপনি ঠিকই বলেছেন। দেশে কৃষি খাতের প্রধান সমস্যা বিপণন। দেখা যায়, গ্রামীন উৎপাদকের কাছ থেকে মধ্যস্বত্বভোগীরা খুব স্বল্পমূল্যে পণ্য কিনে এনে ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে তার ৫/১০ গুন অধিক মূল্যে বিক্রি করে। কিন্তু উৎপাদক হয়তো উৎপাদন খরচও উঠাতে পারছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শহরে চাহিদা থাকলেও উৎপাদকের পণ্য ক্ষেতেই পচে নষ্ট হচ্ছে। করোনাকালে এই সংকট আরো বেশি বেড়েছে। তবে আশার কথা অনেক স্থানেই মোবাইল অ্যাপস বানিয়ে অনলাইনে পণ্য বিক্রি করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এটা দেশব্যাপী বিস্তৃত হলে সুফল পাওয়া যাবে।

প্রত্যয় : কৃষকদের জন্য আপনাদের কোনো উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলবেন কি?

ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ : কৃষি খাতের জন্য আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছি। দুগ্ধ খামারিদের জন্য কম সুদে ঋণ দিচ্ছি। আমাদের স্লোগান হচ্ছে 'দুধ ফেলো না করোনাকালে/ঘি বানাও সবাই মিলে।' শুধু ঘি নয়, দুগ্ধজাত বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে মিল্ক ভিটার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ হারে খামারিদের ঋণ দিচ্ছি।

বুরো বাংলাদেশ এর মাধ্যমে আমরা আদা চাষীদের ঋণ দিচ্ছি। আমদানিকারকদের বলা হয়েছে, তাদের চাহিদার ১০% আদা দেশের বাজার থেকে কিনতে হবে। আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি, প্রতি বছর দেশে দেড় লাখ টন আদা উৎপাদন হবে। আমদানির পরিমাণ কমে আসবে। আমি মনে করি, এই ব্যবস্থায় দেশে ব্যাপক পরিমাণ আদা উৎপাদিত হবে এবং একসময় আর আদা আমদানির প্রয়োজন হবে না। আমরা ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ এর মাধ্যমে পেঁয়াজ চাষীদেরও স্বল্প সুদে ঋণ দিচ্ছি। টমেটো চাষীরাও ঋণ পাবে। আমি বিশ্বাস করি দেশব্যাপী বিস্তৃত বুরো বাংলাদেশসহ অন্যান্য এনজিওদের কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের সুযোগ করে দিলে দেশের করোনাকালীন স্থবির অর্থনীতি চাঙ্গা করা সম্ভব হবে।■

● ফেরদৌস সালাম

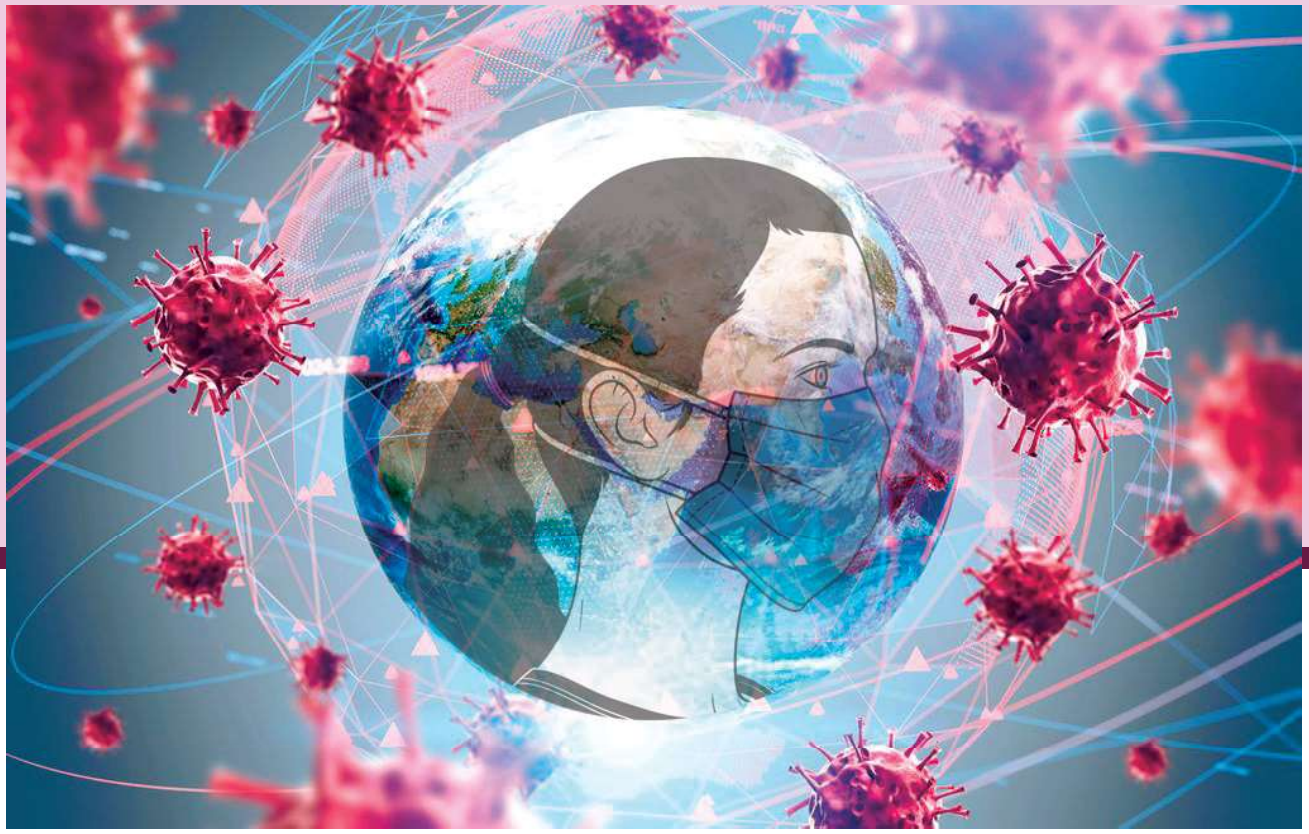

নভেল করোনাভাইরাস : একটি পর্যালোচনা

কাজী আসাদুজ্জামান

প্রকৃতিতে নানা ধরণের অসংখ্য ভাইরাস বিদ্যমান। এর মধ্যে এক ধরনের ভাইরাস আছে যেগুলোর উপরিভাগ দেখতে Crown বা মুকুটের মত। এই ক্রাউন থেকেই এদের নাম দেয়া হয়েছে করোনাভাইরাস। মানবদেহ ছাড়াও এই ধরনের ভাইরাস অন্যান্য জীব যেমন– উট, ঘোড়া, বিড়াল, বাদুড় ইত্যাদি প্রাণীর মাঝেও দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত অন্যান্য জীবদেহ থেকে মানব শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বিরল কিন্তু অসম্ভব নয়। মানবদেহে যে করোনাভাইরাসগুলোর সংক্রমণ ঘটে তার বেশিরভাগই প্রায় ভোগায় না, অল্পসংখ্যক মৃদু ভোগায় কিন্তু কোনো কোনোটি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

বিজ্ঞানীরা এই গোত্রের প্রথম হিউম্যান ভাইরাসটি আবিষ্কার করেন ১৯৬৫ সালে। নিকট অতীতে যে করোনাভাইরাসগুলো মানবকুলে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে সেগুলো হচ্ছে MERS-CoV এবং SARS-CoV। সার্স ভাইরাসটি প্রথম উদ্ভূত হয় চীনে ২০০২ সালে এবং ২৮ টি দেশে তা ছড়িয়ে পরে। ২০০৩ সাল নাগাদ এটা মোট ৮০০০ মানুষকে সংক্রমিত করে এবং ৭৭৪ জন প্রাণ হারায়। আর ২০১২ সালে সৌদি আরবে মার্স ভাইরাসটি ধরা পরে এবং এতে মোট ৮৫৮ জন মারা যায়। করোনাভাইরাস কুলপুঞ্জে সর্বশেষ যে মারাত্মক নতুন ভাইরাসটির অভ্যুদয় হয়েছে তার নাম নোভেল করোনাভাইরাস। নোভেল অর্থ নতুন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ভাইরাসটির নাম SARS-CoV2 এবং রোগটির নাম COVID 19 (নোভেল করোনাভাইরাস ডিজিজ-১৯)। বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে যে বিপর্যয়কর অবস্থা চলছে তার মূলে এই সর্বশেষ করোনাভাইরাসটি। নোভেল করোনাভাইরাসটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সংক্রমণ ঘটায়। সাধারণত আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি, থুতু ইত্যাদি থেকে নির্গত ড্রপলেট থেকে এই ভাইরাসটি একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে প্রবেশ করে থাকে। এই ড্রপলেট যেখানে পতিত হয় সেখানে, সারফেসের প্রকারভেদে দুই তিন ঘণ্টা থেকে তিন চার দিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। মাটি, কাঠ, কাপড় বা এই জাতীয় জিনিসের উপর এটা তিন চার ঘণ্টার বেশি বেঁচে থাকে না। কিন্তু ইস্পাত, প্লাস্টিক বা এই জাতীয় কোনো কোনো জিনিসের উপর তিন চার দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। ভাইরাস নিজে নিজে বেঁচে থাকতে পারে না। কোন না কোন জীবদেহে প্রবেশ করার পর আশ্রয়দাতার দেহকোষে বসতি গেড়ে দ্রুতগতিতে নিজেকে মালটিপ্লাই করে যেতে থাকে। ড্রপলেট যেখানে পড়ে সেখানে হাতের ছোঁয়া লাগলে অথবা আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে হ্যান্ডসেইক বা অন্য কোনভাবে স্পর্শ থেকে ভাইরাসটি হাতে চলে আসতে পারে। এই হাত মুখে, চোখে বা নাকে লাগালে সেখান দিয়ে ভাইরাসটি তার দেহে প্রবেশ করতে পারে। আবার এই ভাইরাসটি আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস, কথাবলা, হাঁচিকাশি ইত্যাদি থেকে নির্গত অতি সূক্ষ্ম কণাগুলোতে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত বাতাসে ভাসমান থাকতে পারে এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অন্যের দেহে প্রবেশ করতে পারে। কেউ খুব কাছাকাছি থাকলে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি কাশি থেকে নির্গত ভাইরাস সরাসরি তার দেহে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারে।

এই ভাইরাসে সংক্রমণের লক্ষণগুলো হচ্ছে–

জ্বর, মাথাব্যথা, শীত অনুভব করা, কাঁপতে থাকা, পেশী ব্যথা, স্বাদ-গন্ধের অনুভূতি হারানো, কাশি, গলাব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। সাধারণত সংক্রমণের পাঁচদিন পর থেকে লক্ষণগুলো দেখা দিয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংক্রমণের চৌদ্দদিন বা তার পরেও লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। এই ধরণের আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের অজান্তেই ব্যাপকভাবে সমাজে সংক্রমণ ঘটিয়ে যেতে পারেন। এটা খুবই বিপদজনক।

বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ভাইরাসটি যখন ফুসফুসে আক্রমণ করে তখন রোগী প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট অনুভব করে থাকে। এটাই হচ্ছে সবচাইতে বিপদজনক পর্যায়। আক্রান্তদের মধ্যে মোটামুটি ৮০% কয়েকদিন যন্ত্রণা পোহাবার পর কোন প্রকার ওষুধ ছাড়াই আপনা আপনি সেরে উঠে। তবে কারও কারও শ্বাসকষ্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে যে, রোগীকে ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে অক্সিজেন প্রদানের দরকার হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যে সব রোগী ভেন্টিলেটরের পর্যায়ে প্রবেশ করে তাদের ৮০% ই সাধারণত আর ফিরে আসে না। আক্রান্তদের মধ্যে যাদের বয়স ষাটের বেশী কিংবা যাদের আগে থেকেই হার্ট, লিভার, কিডনির বা অন্যকোন অসুখ থাকে অথবা ডায়াবেটিসের সমস্যা থাকে মৃতদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই অধিক।

যখনই কোনো ক্ষতিকর সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস কোনো মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটায় তখন তা অন্যদের মাঝেও সংক্রমিত হতে থাকে। শুরুতেই সংক্রমণকে ঠেকানো না গেলে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এপিডেমিক এমনকি প্যানডেমিকে পরিণত হতে পারে। এপিডেমিক এবং প্যানডেমিকের পার্থক্য হচ্ছে বিস্তৃতির ব্যাপকতার পরিধিতে। কোনো সংক্রমণ যখন একটি অঞ্চলে বা একটা দেশের মধ্যে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে এপিডেমিক বলে। আর সংক্রমণটি যদি অনেকগুলো দেশের মধ্যে অথবা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সেটা প্যানডেমিক। বর্তমানের নোভেল করোনাভাইরাসটির সংক্রমণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই এটা একটা প্যানডেমিক।

এই ধরণের সম্ভাব্য একটি পরিস্থিতি মোকাবিলার দুইটি পর্যায় থাকে, এক- কনটেইনমেন্ট এবং দুই- মিটিগেশন। একেবারে শুরুর দিকেই যদি প্রথম রোগীটিকে অথবা অল্প সংখ্যক রোগীকে চিহ্নিত করে আইসোলেট করে ফেলা যায় এবং এরা যাদের সংস্পর্শে এসেছিল তাদের টেস্ট করে দরকার অনুযায়ী হসপিটালাইজেশন বা আইসোলেশনে নেয়া যায়, তাহলে ভাইরাসটি আর সংক্রমণ ঘটাতে পারেনা। সময়মত ধরতে পারলে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিলে সংক্রমণকে ঐ কয়েকজনের মধ্যে সীমিত রেখে সম্ভাব্য এপিডেমিককে রুখে দেয়া সম্ভব। এটাকে বলে কনটেইনমেনট। পক্ষান্তরে, ভাইরাসটি একবার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে তখন তাকে আর আটকে ফেলা যায় না। এই পর্যায়ে এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। যেমন ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, সেলফ কোয়ারেনটাইন, লক ডাউন ইত্যাদি। বর্তমানের করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে এখন বিশ্বজুড়ে যা করা হচ্ছে। সেই পদক্ষেপগুলোকে বলে মিটিগেশন।

ঠিক কিভাবে এই ভাইরাসটি প্রথম রোগীটিকে সংক্রমণ ঘটিয়েছিল তা এখনো অজ্ঞাত। তবে এই সংক্রমণটি সর্বপ্রথম ছড়িয়ে পড়ে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে। উহানের যে ডাক্তারটির চোখে বিষয়টি প্রথম ধরা পড়ে, সে এ ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। এই সময়টাই ছিল সংক্রমণটিকে অন্তরীণ (Contain) করে ফেলার উপযুক্ত সময়। কিন্তু চীন সরকার সংক্রমণ ঠেকানোর যথার্থ কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে এই ডাক্তারের বিরুদ্ধে বরং অপপ্রচারের অভিযোগ এনে নিগ্রহ চালিয়েছিল। যে মুহূর্তে চীন ব্যাপারটার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে উহান শহরটাকে লক ডাউন করে দিল, তার অনেক আগেই সর্বনাশ যা ঘটার তা ঘটে গেছে। কারণ সংক্রমণটি উহানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত উহান শহর থেকে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল চালু ছিল।

করোনাভাইরাসটির উৎস হিসেবে অনেকগুলো ন্যারেটিভ চালু আছে। কেউ বলেছে ভাইরাসটি উহানের একটি ওয়েটমার্কেট থেকে বাদুড়ের দেহ থেকে ছড়িয়েছে। কেউ বলছেন এটা উহানের একটা বায়োরিসার্চ ল্যাবরেটরি থেকে দুর্ঘটনাক্রমে ছড়িয়ে পরেছে। চীন থেকে বলা হয়েছিল, চীনে সফরকারী আমেরিকার সামরিক বাহিনীর সদস্যদের থেকে এটা উহানে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক কোথা থেকে কিভাবে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও এটা যে চীনের উহান শহর থেকেই প্রথম ছড়িয়েছে এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। আর আমেরিকার বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে এই ভাইরাসটি ল্যাবরেটরিতে মানবসৃষ্ট নয়, প্রাকৃতিক উৎস থেকেই এসেছে, খুব সম্ভবত বাদুড়ের থেকে।

বিস্তৃতির দিক থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে এই মাপের একটা প্যানডেমিক এই প্রথম। এখন পর্যন্ত বিশ্বের মোট ২১৩ দেশে এই সংক্রমণটি ছড়িয়ে পড়েছে, মোট ১ কোটি ৯৫ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, ১ কোটি ১৮ লক্ষ নিরাময় হয়েছে এবং প্রায় ৭ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। এত দ্রুত এই ভাইরাসটির সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরার পিছনে দুটো বড় কারণ রয়েছে। প্রথমত, ভাইরাসটি অত্যন্ত সংক্রামক এবং দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির এই যুগে চরম উৎকৃষ্ট বিমান যোগাযোগের কারণে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দূরত্ব মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নেমে এসেছে। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গমনাগমন করছে। বর্তমান যুগে শুধুমাত্র একজন আক্রান্ত ব্যক্তির একবার মাত্র কোনো আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ভ্রমণ করলেই এই ধরণের একটি ভাইরাসের সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া সম্ভব।

সংক্রমণের ব্যাপ্তির দিক থেকে কোভিড-১৯ বিশ্বের বৃহত্তম প্যানডেমিক হলেও ভোগান্তির ভয়াবহতা এবং মৃত্যু সংখ্যার দিক থেকে এর চেয়ে শতগুণ ভয়ংকর এপিডেমিক বা প্যানডেমিক মানব ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে। লিখিত ইতিহাসে সর্বপ্রথম এপিডেমিক হয়েছিল ৫৪১-৫৪২ খৃষ্টাব্দে। এই এপিডেমিকটি Justinian Plague নামে পরিচিত। এই মহামারীতে আনুমানিক মৃত্যু সংখ্যা দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। ধারণা করা হয়, এই মহামারীতে সমগ্র ইউরোপের অর্ধেক মানুষই মারা গিয়েছিল। ১৩৪৬ থেকে ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দ ব্যাপী আরেক মহামারীতে আনুমানিক সাড়ে সাত কোটি থেকে বিশ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল। আমরা সাধারণভাবে এটাকে প্লেগ নামে জানি। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশ জুড়ে এই মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। এই মহামারীটি ইতিহাসে ব্ল্যাক ডেথ নামে পরিচিত। অনুমান করা হয়, এশিয়াতে উদ্ভূত হয়ে ইঁদুরের মাধ্যমে সমুদ্রগামী জাহাজের বন্দর থেকে বন্দরে পরিক্রমণের পথ ধরে এই মহামারীটি আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীতে সাতটা কলেরা প্যানডেমিকের মধ্যে ১৮৫২ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত আট বৎসর ব্যাপী তৃতীয় কলেরা প্যানডেমিকটি ছিল পৃথিবীর রেকর্ডকৃত ভয়াবহ প্যানডেমিকগুলোর অন্যতম। ভারতে উদ্ভূত হয়ে এই কলেরা মহামারী ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে আনুমানিক মোট দশ লক্ষ মানুষ মারা যায়। ১৮৮৯-১৮৯০ সময়কালে দেখা দিয়েছিল ফ্লু প্যানডেমিক যেখানে আনুমানিক দশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ আরেকটি প্যানডেমিক ছিল ১৯১০-১৯১১ সালের ষষ্ঠ কলেরা প্যানডেমিক। এটাও ভারতে শুরু হয়ে মধ্যপ্রাচ্য,উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ এবং রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ষষ্ঠ কলেরা মহামারীতে মারা গিয়েছিল আনুমানিক আট লক্ষ

মানুষ। ১৯১৮-১৯২০ সালের ফ্লু প্যানডেমিক ছিল আরেকটি ভয়াবহ মহামারী যেটাতে পাঁচ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সালের এশিয়ান ফ্লুতে মারা গিয়েছিল আনুমানিক বিশ লক্ষ মানুষ। এটারও উৎপত্তি ছিল চীনে; এটা হংকং, সিঙ্গাপুর হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৬৮ সালের হংকং ফ্লুতে মারা গিয়েছিল দশ লক্ষ মানুষ। হংকং-এ উদ্ভূত হয়ে এই ভাইরাসটি সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ফ্লুতে মারা যায় দশ লক্ষ মানুষ। ২০০৫ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এইচ আই ভি/এইডস প্যানডেমিকে মারা গিয়েছিল তিন কোটি মানুষ।

গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বর্তমান শতাব্দীর শুরুর দিক পর্যন্ত মাত্র পঞ্চাশ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে ইবোলা, এইডস, সার্স, মার্স ইত্যাদি অনেকগুলো ভাইরাসের সংক্রমণ এপিডেমিকে পরিণত হওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাসহ বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। শুধুমাত্র জীবাণু অস্ত্র নয়, মানব কল্যাণকে সামনে রেখেও সাধারণভাবেই সারা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে জীবাণু নিয়ে যে গবেষণা চালু আছে তাতে হিউম্যান এরোর বা নিছক কোনো দুর্ঘটনাক্রমে যে কোনো সময় এইসব ল্যাবরেটরি থেকেও কোনো একটা ভাইরাস বাইরে চলে আসতে পারে। বিমান পরিবহণের বদৌলতে বর্তমান বিশ্ব যেভাবে পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে আছে, তাতে যেকোনোভাবে একটা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া মানব দেহে সংক্রমণ ঘটালে তা অতি অল্প সময়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার আশংকা বহুদিন থেকেই বিদ্যমান আছে। এই আশংকাকে মাথায় রেখে অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে এবং অনেক বইপত্র লেখা হয়েছে। John Barry'র দি গ্রেট ইনফ্লুয়েঞ্জা বইটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী সম্ভাব্য কোন প্যানডেমিক মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি এজেন্সির জন্ম দেন। এই এজেন্সি বিশ্বব্যাপী Early Warning Systemসহ একটা ব্যাপকভিত্তিক প্যানডেমিক প্ল্যান গ্রহণ করে। হলিউডের চিত্র পরিচালক Steven Soderbergh ২০১১ সালে Contagion নামে একটা চলচ্চিত্র তৈরি করেন যার সাথে বর্তমানের করোনাভাইরাস পরিস্থিতির আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য রয়েছে। বিভিন্ন ফোরামে বিল গেটসসহ অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য একটা প্যানডেমিকের ব্যাপারে সতর্ক করে আসছিলেন। করোনাভাইরাস মহামারীটি আমাদের দেশে প্রায় সকল মহলে চরম বিস্ময় আর আতংকের সৃষ্টি করলেও উন্নত বিশ্বের

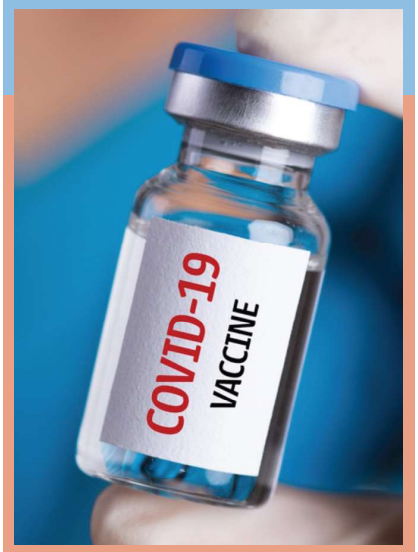

বিজ্ঞানীসমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে এটা আকস্মিক কিছু ছিল না।

মানবজাতির ইতিহাসের সেই শুরু থেকেই বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু বিধ্বংসী ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস অকল্পনীয় প্রাণহানির কারণ হয়েছে। তখন চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নত ছিল না। যুগের পর যুগ মানুষ সেই সমস্ত সংক্রামক ব্যাধির অসহায় শিকার হয়ে সীমাহীন যন্ত্রণাভোগ এবং মৃত্যুবরণ করে এসেছে। ধীরে ধীরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষ এই সমস্ত রোগ ব্যাধির অধিকাংশেরই প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে এবং অনেকগুলোকেই চিরতরে উচ্ছেদ করতে পেরেছে। করোনাভাইরাসের গোত্রভুক্ত অন্যান্য করোনাভাইরাসগুলোর উপর বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজ ইতোমধ্যে অনেক বছর গবেষণা করে অনেক ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নভেল করোনাভাইরাসটির ভ্যাকসিন বা ওষুধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এই তথ্য উপাত্ত সমূহ অনেক সাহায্য করবে। ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশসমূহের বিজ্ঞানী সমাজ অন্তত শ' খানেক ভ্যাকসিন প্রজেক্টের উপর জোরেশোরে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণত কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কারে পাঁচ সাত বছর সময় লেগে যায়। সৌভাগ্যবশত নোভেল করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারের ব্যাপারে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরা বার থেকে আঠার মাসের মধ্যে সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করে যাচ্ছেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকদল আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই তাদের ভ্যাকসিনটি বাজারে নিয়ে আসতে পারবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যাক্ত করেছেন। তবে খুব বেশি হলেও ২০২১ সালের মধ্যেই যে একটা কার্যকর ভ্যাকসিন বা ওষুধ বাজারে আসবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহ বলেই প্রতীয়মান হয়।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এই রকমের একটা মহাদুর্যোগ যে কোনো সময় দেখা দিতে পারার সম্ভাবনার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের প্রায় সবগুলো দেশই এ ব্যাপারে যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের কাছে পূর্ব প্রস্তুতির ব্যাপারে খুব বেশি কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু চীনের সীমানা ছাড়িয়ে ভাইরাসটি যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করলো, তখন বাংলাদেশে এর আগমনের ব্যাপারে অনিশ্চয়তার কিছু ছিল না। এমনকি বাংলাদেশে প্রথম রোগীটি ধরা পরার পরও যে দীর্ঘ সময় পাওয়া গিয়েছিল, তারপরও বাংলাদেশ এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রত্যাশিত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি বলেই আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়।

মিটিগেশনের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশগুলোই লক ডাউনের মাধ্যমে জনগণকে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করিয়ে ভাইরাসের সংক্রমণ বন্ধ করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এই পদ্ধতির গুরুতর সমস্যা হচ্ছে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে ভয়ংকর সংকট তৈরি হওয়া। উৎপাদন এবং আয় রোজগার বন্ধ হয়ে অসংখ্য মানুষের চরম দুর্দশায় নিপতিত হওয়া। তাছাড়া একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব নয় যা বেশ সময় সাপেক্ষ। এইসব বিবেচনায় নিয়ে সুইডেন একটা ভিন্ন মডেল অনুসরণ করেছে। তাহলো, বয়স্ক এবং অসুস্থ মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করে বাকী সবার জন্য স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উন্মুক্ত রেখে কিছু প্রাণহানিকে মেনে নেয়া। তাদের ধারণা, এতে শুরুর দিকে কিছু প্রাণহানি ঘটলেও দীর্ঘমেয়াদে জনগণ ভাইরাসটির বিরুদ্ধে ইমিউনিটি অর্জন করবে। এভাবে, অর্থনৈতিক দুর্গতি এড়িয়ে ভাইরাসটিকে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। কোন মডেলটি শেষ বিচারে বিশ্ব মানবতার আদালতে সঠিক বলে গৃহীত হয় সেটা আগামীতে দেখা যাবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বাংলাদেশ নিজের অজান্তেই এই দুইয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলেছে।

পরিশেষে, একটা কথা বেশ জোরের সাথেই বলা যায়, দুদিন আগে হোক আর দুদিন পরে হোক নোভেল করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন এবং চিকিৎসা দুইই আবিষ্কৃত হবে এবং বিশ্ব এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নকে পেছেনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। নোভেল করোনাভাইরাস প্যানডেমিকটি অন্যতম ভয়াবহ একটি মহামারী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবে।■

● লেখক: কান্ট্রি চিফ
বাংলাদেশ হাবিব আমেরিকান ব্যাংক

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি
সঙ্কট উত্তরণে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা

ফেরদৌস সালাম

প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিশ্ব এখন টালমাটাল। ছোঁয়াচে এই ভাইরাস এ পর্যন্ত প্রায় ২১৩টি দেশে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ঘটিয়েছে। কিন্তু সকলকে পরীক্ষার আওতায় আনা সম্ভব না হওয়ায় সংক্রমণের সংখ্যা এখন ২ কোটির উপরে। এর মধ্যে মৃত্যু ঘটেছে ৭ লাখেরও বেশি মানুষের। বাংলাদেশেও এই ভাইরাসের ছোবলে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে মৃত্যুর মিছিল, আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে বানের জলের মতো।

করোনা ভাইরাস যে শুধুমাত্র মৃত্যুই ডেকে আনছে তাই নয়, এটি দেশে দেশে অর্থনীতির চাকাকেও রুদ্ধ করে দিয়েছে। স্থবির করে দিয়েছে জনজীবন ও উৎপাদনের প্রায় সকল প্রক্রিয়া। যেহেতু এটি অতি ছোঁয়াচে একটি সংক্রমণশীল ভাইরাস সেহেতু স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী মানুষের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরা, ২০ সেকেন্ড ধরে ঘন ঘন সাবান পানিতে হাত ধোয়া কিংবা স্যানিটাইজার ব্যবহার অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ করোনাকে দূরে রাখতে হলে এসব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 'ইমিউনিটি' বৃদ্ধি করতে হবে।

স্বাভাবিকভাবে করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রেই নানা ধরনের উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থা বা লকডাউন অন্যতম। বাংলাদেশে দুই মাসের বেশি সাধারণ ছুটির ব্যবস্থাপনায় অবরুদ্ধ অবস্থা কার্যকর ছিল। অফিস-আদালত থেকে শুরু করে শিল্প-কারখানা সব বন্ধ ছিল। এতে দেশের অর্থনীতি মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। রপ্তানিখাতে বিশেষ করে গার্মেন্টস খাত বন্ধ হয়ে পড়ায় একদিকে উৎপাদন বন্ধ থাকায় অনেক আন্তর্জাতিক চাহিদা বাতিল হতে থাকে, অন্যদিকে লাখ লাখ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে বিদেশে রপ্তানি চালু রাখতে সীমিত আকারে গার্মেন্টস খুলে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

লকডাউন মুহূর্তে সাধারণ ছুটির মধ্যে ১ মাস জরুরি সেবা ছাড়া প্রায় সবকিছুই বন্ধ ছিল। গত দুই মাসে বেকার হয়ে গেছেন কয়েক লাখ শ্রমজীবী মানুষ। রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক রেমিটেন্সের পরিমাণ অনেক কমেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ প্রায়। কিছু দোকানপাট ও হাটবাজার ছাড়া কার্যত সব বন্ধ হয়েছিল।

বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মত বড় বড় আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির আভাস দিয়েছে। বাংলাদেশ গত ক'বছর যাবতই প্রবৃদ্ধির হার ৮% করতে সক্ষম হয়েছে। আশা করা হয়েছিল এই ধারা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু করোনার কারণে এই হার অনেক কমে যাবে।

বিশ্ব ব্যাংক বলছে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ২ থেকে ৩ শতাংশে নেমে আসবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এডিবি বলছে, করোনার কারণে বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.২ শতাংশ থেকে ০.৪ শতাংশ ক্ষতি হতে পারে। এডিবি আরো বলেছে, বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে ১৪ লাখ থেকে ৩৭ লাখ মানুষ বেকার হতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে ১৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি। আইএমএফ বলছে, ২০২০ সালে প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশে নেমে আসবে।

অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেনের মতে, এ মুহূর্তে প্রবৃদ্ধি নিয়ে বেশি চিন্তা না করে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। অর্থনীতি পুনরুদ্ধার সঠিকভাবে হলে বিপুল মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। মানুষের হাতে টাকা থাকলে ভোগের চাহিদা বাড়বে। অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।

বিশ্ব ব্যাংক জানিয়েছে, করোনার প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। উৎপাদন খাত বিশেষ করে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকের চাহিদা বিশ্বব্যাপী কমে যাবে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ উৎপাদন খাতের পণ্যের চাহিদাও কমবে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ঝুঁকি তৈরি করবে। এতে নগর দারিদ্র্য বাড়বে। আবার পল্লী এলাকায় গরিবের সংখ্যাও বাড়বে। এমন অবস্থায় কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি কমানো এবং আর্থিক খাতের ভঙ্গুরতার ঝুঁকি কমাতে অর্থনীতিতে মধ্যমেয়াদি পুনরুদ্ধার কর্মসূচি নেয়ার সুপারিশ করেছে বিশ্বব্যাংক।

তাদের এসব মূল্যায়নের আলোকে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকারের উচিৎ একটা রোডম্যাপ আঁকা। সেক্ষেত্রে প্রথমেই নজর দিতে হবে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর

অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে স্বাভাবিক রাখা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা। একটি বিষয় অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের কৃষি খাতের বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনসহ কৃষি উন্নয়নের ব্যাপক উন্নতি হওয়ার কারণেই দেশ আজ দারিদ্র্য অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তান আমলের বাংলাদেশের জনসংখ্যা মাত্র ৪ কোটি হলেও প্রায় ২ কোটি মানুষকেই অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতে হতো। তখনকার সময়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের ভাষণে দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের সংস্থান করার প্রতিশ্রুতি দিতেন। তখনকার পরিস্থিতি এমন ছিল যে, শহর ও গ্রামের দরিদ্র মানুষকে বছরে একটা দুটো পরিধেয় লুঙ্গি ও শাড়ি যোগাড় করতেও গলদঘর্ম হতে হতো। এই ১৯৬৯-৭০ সালেও দেখেছি গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়িতে বছর ভিত্তিতে 'কামলা' (বার্ষিক শ্রমিক) রাখা হতো– বেতন হতো বছরে ৬০ টাকা থেকে ১০০ টাকা। ১০০ টাকার কামলার সম্মান ছিল আলাদা– তাকে নিয়ে অন্যরা ঈর্ষা করতো। তাদেরকে বছরে ২/৩টা লুঙ্গি দেয়া হবে সেটাও উল্লেখ থাকতো। তখন মানুষের দারিদ্র্য ছিল ভীষণ। স্বাধীনতার পরও বেশ ক'বছর মানুষ কঠিন দারিদ্র্যের শিকার ছিল। স্বাধীনতার পরেও দেশে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এর মূল কারণ ছিল খাদ্য সঙ্কট। পরবর্তীতে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অর্জিত হয় সাফল্য। ফলে একই পরিমাণ জমিতে অধিক ফসল/একাধিক ফসল উৎপাদন হওয়ায় বাংলাদেশ খাদ্য সঙ্কট থেকে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বলা যায়, বাংলাদেশ এখন খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটি বাংলাদেশের জন্য বিশাল সাফল্য।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় ৪৯ বছর। সে হিসেবে দেশের অর্থনীতি যতোটা শক্ত সামর্থ্য থাকার কথা ছিল, তা হয়নি। তবে আশার কথা, গত দু'দশকে দেশের অর্থনীতিতে একটি বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দরিদ্র অর্থনীতির উত্তরণ ঘটিয়ে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এই উন্নয়নের পেছনে গার্মেন্টস ও বৈদেশিক রেমিটেন্সের পাশাপাশি যে খাতটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তা হচ্ছে এনজিও ও এমএফআই-এর ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা। দেশব্যাপী প্রায় শতাধিক এমএফআই দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষে প্রায় ৩ কোটি দরিদ্র, হতদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষকে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করেছে। এই ক্ষুদ্রঋণপ্রাপ্ত পরিবারসমূহ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যেমন হাঁস-মুরগীর ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, সবজি বাগান, মাছ চাষ, দোকান ইত্যাদি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করে নিজেরাও যেমন স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে তেমনই দেশজ উৎপাদনেও সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে যেসব পরিবার দরিদ্র ও হতদরিদ্র ছিল তাদের এক বিশাল অংশেরই দারিদ্র্য নিরসন হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি কেউ কেউ অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি ও মহাজনী ঋণগ্রস্ত হাত স্বাবলম্বী কর্মীর হাতে পরিণত হয়েছে। এভাবেই দেশজ উৎপাদন ও দারিদ্র্যের হার কমে যাওয়ায় জাতীয় অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের কাতার ছেড়ে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে ব্র্যাকসহ বেশ কিছু এনজিও মানুষের মধ্যে বিশেষ করে দরিদ্র ও হত দরিদ্রদের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতো। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীদের আত্মকর্মসংস্থান ও নারী-পুরুষ বৈষম্য অবসানের আশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ই ছিল মুখ্য। স্বাধীনতার শুরুতে ব্র্যাক ও পরে আশির দশকের দিকে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকসহ (অক্টোবর ১৯৮৩) এনজিও সমূহ ক্ষুদ্র ঋণের সূচনা করে। এতে করে ব্যাংকের ঋণ বঞ্চিত বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে নারীরা ব্র্যাক, আশা ও বুরো বাংলাদেশসহ বিভিন্ন এমএফআই থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নেয়ার সুযোগ পায়। এই ঋণে তারা হাঁস, মুরগী, গবাদি পশু, মাছ চাষসহ সবজি উৎপাদন করে নিজেরাই শুধু স্বাবলম্বী হয়নি দেশের জাতীয় উৎপাদনেও নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তিকে যুক্ত করেছে।

উল্লেখ্য, দেশের সব মানুষের বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে হাতের কাছে ব্যাংক না থাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ কম। ১০ টাকায় খোলা হিসাবসমূহ লেনদেনের অভাবে প্রায়ই অকার্যকর হয়ে পড়েছে। ২০১৮ সালের বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ৫০ ভাগের ব্যাংক হিসাব রয়েছে। কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে এই হার ২৫ ভাগের উপরে নয়। নারীদের ক্ষেত্রে এই হার আরও কম। ২১.২ শতাংশ জনগণ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত। ৯.৯ শতাংশ মানুষের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় রয়েছে এবং ঋণ রয়েছে ৯.১ শতাংশ ব্যক্তির। ব্যাংকগুলোর গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত নেটওয়ার্ক না থাকায় দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী ব্যাংকে সঞ্চয় ও ঋণ থেকে বঞ্চিত। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী এনজিও এবং এমএফআই ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

স্বাভাবিকভাবেই এটি বাস্তব সত্য যে, ক্ষুদ্র ঋণ দ্বারা সৃষ্ট এই অর্থনৈতিক শক্তিই মূলত দেশের

দেশব্যাপী প্রায় শতাধিক এমএফআই দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষে প্রায় ৩ কোটি দরিদ্র, হতদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষকে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করেছে। এই ক্ষুদ্রঋণপ্রাপ্ত পরিবারসমূহ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যেমন হাঁস-মুরগীর ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, সবজি বাগান, মাছ চাষ, দোকান ইত্যাদি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করে নিজেরাও যেমন স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে তেমনই দেশজ উৎপাদনেও সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্থনীতির প্রধান নিয়ামকে পরিণত হয়েছে। এমএফআই খাতের দেড় লাখ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণে প্রায় ৩ কোটি মানুষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করছে। তারা শুধু আর্থিকভাবেই দারিদ্র্য দূর করেনি, তারা এখন সামাজিক সচেতনতার বেষ্টনিতেও অবস্থান করছে। তারা পরিবারের স্বাস্থ্য, সন্তানের শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও শৌচাগার ব্যবহারে সচেতন হয়েছে। নিজেরা সামাজিকভাবে মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। সর্বোপরি আর্থিক স্বচ্ছলতা তাদেরকে 'মানুষ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ এনে দিয়েছে এবং সবই সম্ভব হয়েছে ক্ষুদ্রঋণ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে।

এভাবেই বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে বাংলাদেশ ক্রমাগত সামনের দিকে এগুচ্ছিল। বাংলাদেশের জিডিপি'র (Gross Domestic Product) মোট দেশীয় উৎপাদন হার এ ক'বছর ধরে ৭% থেকে প্রায় ৮% হচ্ছিল। কিন্তু করোনার আঘাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ায় এ বছর এবং পরবর্তী কয়েক বছর এই ধকল সামলাতে হবে। এতে প্রবৃদ্ধির হার ৪% এ নেমে আসার আশংকা করছেন অর্থনীতিবোদ্ধারা। সেক্ষেত্রে এই ধস ঠেকাতে সরকারকে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

এক সময় বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশ হলেও এখন এর বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। শিল্পায়নের ফলে কৃষি নির্ভরতা অনেক কমলেও দেশের বার্ষিক জিডিপিতে এখনো এ খাতের অবদান প্রায় ১৩.৫০%। এ খাতে দেশের প্রায় ৪০.৫০% জনগণ সম্পৃক্ত। তবে এই কৃষকদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভলো নয়। প্রয়োজনীয় সার-বীজ-কীটনাশক ব্যবহার না করতে পারায় ফসল উৎপাদনের পরিমাণ উৎপাদন পর্যায়ের চেয়ে ২৫% কম হয়। অনেক কৃষককেই এ জন্য মহাজনের নিকট থেকে টাকা ঋণ নিয়ে উৎপাদিত পণ্য বন্দক দিতে বাধ্য হতে হতো। এই কৃষক শ্রেণীকে ব্যাংক ও এমএফআই খাত ঋণ সহায়তা প্রদান করায় এই অবস্থা থেকে তাদের বেশ উত্তরণ ঘটেছে এবং দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নিকট অতীতেও দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশের উপরে। বর্তমানে এই হার নেমে এসেছে ২০.৪০%-এ। কিন্তু করোনার আঘাতে দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দারিদ্র্যের হার পুনরায় বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে এই সঙ্কটে এই হার এ বছর প্রায় ২৫% এ উন্নীত হবার আশঙ্কা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের এক মতামত জরিপে উঠে এসেছে যে, করোনা সংকটে জেলা পর্যায়ে কাজ করা ৯০ শতাংশ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) সম্পদের অপ্রতুলতা আছে। এসব সংস্থা আর্থিক সংকটে পড়েছে। জরিপ অনুযায়ী ৫৪ শতাংশ এনজিও'র নিজস্ব উপার্জনের উৎস আছে। এই উপার্জনের ৫০ শতাংশই আসে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম থেকে। অধিকাংশ এনজিও জানিয়েছে তারা আর্থিক সংকটসহ নানা ঝুঁকির মধ্যে আছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জাতীয় যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুহূর্তে দেশের অন্যান্য আর্থিক খাতের মতো এমএফআই ও এনজিও সেক্টরও দুর্যোগ মোকাবিলায় অর্থসহ নানা সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, এমএফআই ও এনজিও সেক্টর জাতীয় উন্নয়নের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গই যেমন শরীরের জন্যে জরুরি তেমনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা, বিকাশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এনজিও খাতের গুরুত্বও অপরিসীম।

স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান 'ব্র্যাক' যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সূচনা ঘটিয়েছিল এনজিও এবং এমএফআই সেক্টর সেই ধারাকে অব্যাহত রেখেছে বলেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের সিঁড়িতে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এই সেক্টর ভালো থাকলে দেশের উন্নয়কামী দরিদ্র মানুষ ভালো থাকবে এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে দেশ।

যেহেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর এমএফআই ও এনজিও সেক্টর করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দারিদ্র নিরসনের জন্যে দরিদ্র ও হত দরিদ্রদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান অনেকটাই অসমর্থ অবস্থার শিকার–সেক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করার স্বার্থেই এই সেক্টরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ২৫০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন। কারণ, এই সেক্টর সুরক্ষা পেলেই দেশের অর্থনীতি গতিশীল হবে, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে পরিণত হবে অর্থনৈতিক শক্তিতে এবং সমস্যা কাটিয়ে বাংলাদেশ পাবে উন্নত দেশের মর্যাদা।■

পদ্মা সেতু
ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে করোনাকালের অভিজ্ঞতা

এএইচএম নোমান

১০ জুন ২০২০ স্বপ্নের পদ্মা সেতু'র ৩১তম স্প্যান বসানো হয়েছে। মোট ৬.১৫ কিলোমিটারের মধ্যে ৪.৬৫ কিলোমিটার সেতু দৃশ্যমান হলো। করোনা নামক প্রকৃতির প্রতিশোধ পরিস্থিতির মধ্যেও পদ্মা সেতু নির্মাণ থমকে না থাকার জয়গান আমাদের সকলের গর্ব। এটা ছিল 'পদ্মা সেতু নিজের টাকায় করবো' দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার সাহসী ঘোষণা। পদ্মা সেতুর পাশাপাশি পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজও এগিয়ে চলছে সমান তালে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের তত্ত্বাবধানে চীনা কন্সট্রাকশন কোম্পানি নির্মাণ করছে এ প্রকল্পের যাবতীয় অবকাঠামো। এ প্রকল্পের কারণে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের পাওনা অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতাসহ তাদের পুনর্বাসনে কাজ করছে ডরপ।

করোনা মানুষকে মানুষ থেকে আলাদা করে ফেললেও সেতু-রেল লাইন স্থাপন এবং পুনর্বাসন কাজে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের কাজ থেকে রেলওয়ে, সেনাবাহিনী, পরামর্শক দল এবং এনজিও কর্মীদের দূরে রাখতে পারেনি। এ কাজে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে কিভাবে এগুতে হয়েছে তার কয়েকটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, শ্রীনগর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, যশোরসহ ৯টি জেলার নেটওয়ার্কিং রেল সংযোগ দৈর্ঘ্যে ১৬৪ কিলোমিটার। সব স্থানেই জীবনের ঝুঁকি। এলাকায় মাইকিং ও লিফলেট বিতরণসহ করোনা প্রতিরোধ যুদ্ধে সাবধানতার বার্তা ছিল "নিয়মিত হাত ধোয়া। শারীরিক দূরত্ব ও মানসিক শক্তি বজায় রাখুন। কাজ করুন ও কাজকে উপভোগ করুন। প্রয়োজনে ১৬২৬৩/৩৩৩ নম্বরে ফোন করুন। করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকুন।"

গ্রাম দেশে এর প্রথম ধাক্কা আসে ১৯ মার্চ শিবচর উপজেলায়। ডরপ এর সূর্যনগর কার্যালয়সহ প্রশাসন করোনা আক্রান্ত পুরো এলাকা লকডাউন করে। এপ্রিল মাসে সীমিত এবং মে মাস থেকে কার্যক্রম পরিচালনায় ভবনের মালিক-স্থানীয়দের বাধা ও অসহযোগিতামূলক আচরণে স্টাফরা অন্তরীণ হয়ে পড়ে। সুপারভাইজার শফিকুজ্জামান, পুনর্বাসন কর্মী নূরুল ইসলাম ও শফিকুল ইসলাম এবং কম্পিউটার অপারেটর মনিরুল ইসলাম তখন করোনা উপসর্গ নিয়ে অসুস্থতায় ভুগছে। বর্তমানে তারা সবাই সুস্থ। নানা কারণে বেজগাঁও, শ্রীনগর ও মুন্সিগঞ্জ অফিস ভবন ছেড়ে দিতে হয়েছে, বদলীকৃত বা নতুন স্টাফরাও চলাচলে বাধার সম্মুক্ষিণ হয়েছেন। গণ পরিবহনে ২/৩ গুণ ভাড়ায় চলতে হয়েছে। শ্রীনগর অফিসের পুনর্বাসন কর্মী শহিদুল ইসলামের সিজোনাল ফ্লু হলেও ভবনের মালিক এবং এলাকাবাসীর চাপে তাকে দ্রুত সরিয়ে নিতে হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আড়ুয়াকান্দি, ভাংগা, গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও যশোর জেলাসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্তদের তথ্য সংগ্রহে বাড়ি বাড়ি যাওয়া-আসায় এলাকাবাসীর বাধা ছিল প্রতিনিয়ত। জনপ্রতিনিধিরা করোনা ভয়ে সাক্ষাৎ দিতে চাননি। চর যশোরদি ইউপি সচিব করোনায় আক্রান্ত, তাই ইউপি অফিসে কেউ আসে না। নগরকান্দা উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেবের পিএস এর জ্বর হয়েছে, চেয়ারম্যান সাহেবও অফিস করেন না। ক্ষতিগ্রস্তরা ভয়-আতংকে মুখোমুখি হয়ে সাক্ষাৎ দিতে চান না। কর্ম পথে যেখানেই করোনা সন্দেহ, সেখানেই ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টিনে থেকে কাজ করছে, তবুও কাজ ফেলে সরে আসেনি কেউ। হোম কোয়ারেন্টিনে থেকেই কাজ এগিয়ে নিয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মীদের মেসে থাকতে হয়। বাজারে গেলে লোকজন খারাপ মন্তব্য করে। মুদি দোকানদার বাকিতে বিক্রি করা বন্ধ করে দেয়, কখন কে আক্রান্ত হয়- মারা যায় এই ভয়ে। জয়নগর, কাশিয়ানীর পুনবার্সন কর্মী সন্তান সম্ভবা জান্নাতুল ফেরদৌসী গ্রামে ঘোরাঘুরি করেন– এই অভিযোগ এনে বাড়ির মালিক তার মা ও তাকে বাসায় প্রবেশ করতে দেয়নি এবং এমনকি তার কাছ থেকে রুমের চাবি পর্যন্ত নিয়ে নেয়। এছাড়া নাকসী মাদ্রাসা বাজার ও নড়াইল কার্যক্রমে স্থানীয়রা বাধাদান এবং অফিস অবরোধ করেন। জয়পুর পারছাতরা ও তুলারামপুর মৌজায় ১৬ জন করোনা রোগী সনাক্ত হওয়ায় স্বাস্থ্য বিধি মেনে ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে গেলেও ক্ষতিগ্রস্থরা করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আর আসবেন না জানিয়ে দেয়। টাইম লাইন ও কাজ সম্পাদন-মাইলষ্টোন মিলানো, ভূমি আইনের জটিল নিয়ম কানুন ঠিক রাখা ছিল বাস্তব সমস্যা। নড়াইলের পুনর্বাসন কর্মী কাকলী আক্তার, মাসুদা বেগম ও সেহেলী আক্তারকে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আব্দুল আজিজ ও বাড়ির মালিক পারভেজ মিয়া তাদের ভাড়া বাড়ি থেকে তাৎক্ষণিক বের করে দেন। তারপরেও স্টাফরা অফিসের

গেষ্টরুমে অবস্থান করে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। নতুন করে কেউ তাদের বাড়ি ভাড়াও দেয়নি। চারাভিটা বাজার ও বাঘারপাড়া এলাকার স্থানীয়রা ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িতে ঘন ঘন যেতে নিষেধ করেছে।

গ্রামের সাধারণরা করোনা মোকাবিলায় সচেতন নয়, ফলে স্টাফদের সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়েছে। তার পরেও এগিয়ে চলছে, গর্বের পদ্মা সেতু রেল সংযোগ কার্যক্রম। এ যেন মানুষ ও অবকাঠামো উন্নয়নের এক পালাগান। করোনা ভাইরাসের প্রভাব সারা বিশ্বে একই রকম- হতাশাব্যঞ্জক সংবাদের মধ্যেও পদ্মা সেতু-রেলের কর্মযজ্ঞের জয় সংবাদ খুশি বয়ে আনে। পবিত্র কুরআনের বাণী মনে করিয়ে দেয় যে 'অবশ্যই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে'। পদ্মা সেতু ও রেল লাইন সংযোগ দুটো কাজই নিজের পায়ে দাঁড়ানোয় আমাদের জন্য সাহস ও দূরদর্শী অনুপ্রেরণার সিঁড়ি।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষে চীনা বিশেষজ্ঞ দল এবং সেনাবাহিনীর কর্ম ও আবাসিক এলাকায় গাড়ি ও সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল সংরক্ষিত। কিন্তু পিছু হটিনি। আধুনিক টেকনোলোজি ব্যবহার করে কাজের গুরুত্ব ও টাইম লাইন ঠিক রেখে সবই চলছে সেতু নির্মাণের যুদ্ধ জয়ের দিকে। যে চীনে বিধ্বংসী করোনার উৎপত্তি সেই চীনারাই বাংলাদেশে লকডাউনের মধ্যেও যখন যেভাবে প্রয়োজন কাজ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আইসোলেশন-লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশ রেল মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা সকল কার্যক্রম তদারকী করছেন। কেন্দ্রীয়ভাবে একজন মেজর জেনারেলের সমন্বয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত রয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ বিষয়ক জটিল হিসাব (জমি-জমা, গাছ-গাছালি, পুকুর, ধর্মীয় স্থাপনা, কবরস্থান ইত্যাদি) তৈরীতে এনজিও ডরপ ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন– কেউ পিছিয়ে নেই জয়ের প্রত্যয়ে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় অনুমোদিত পুনর্বাসন পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা দ্বিগুণ ছাড়িয়ে গেছে। একই সঙ্গে মৃত্যুসহ আরো অনেক কারণে ওয়ারিশ সংক্রান্ত ঝামেলা বেড়েছে। টাইম বাউন্ড ঠিক রাখা যাচ্ছে না। আরো জমি অধিগ্রহণ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ তৎসংশ্লিষ্ট কাজ বেড়ে যাচ্ছে। পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের মাঠ পর্যায়ে কাশিয়ানীতে উপস্থিতি থেকে মানসিক শক্তি ও উৎসাহ প্রদান ছিল ব্যতিক্রমী। বঙ্গবন্ধুর শোষণহীন সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে এ যেন সবার এগিয়ে যাবার পালা।

এই সোনার বাংলা গড়ার প্রয়োজনে আমরা বরাবরই 'পাবলিক-প্রাইভেট-পুওর পার্টনারশিপ' (পিপিপিপি) নীতিমালা প্রণয়নের দাবি করছি। যাতে কল্যাণকামী সরকারের পুনর্বাসন কার্যক্রমের ক্ষতিগ্রস্তরা আর তলানীতে না যায়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, উচ্ছেদকৃত অবিত্তবান ক্ষতিগ্রস্তরা ১০ শতাংশের বেশী হয়না। প্রস্তাবিত পিপিপিপি'র আওতায় ঝুঁকিপূর্ণদের রেল, সড়ক, সেতু, নৌ-পরিবহন, পানি ও গ্যাস সংযোগ ইত্যাদিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্ডের মাধ্যমে টোল ফ্রি চলাচল ও পণ্য পরিবহন করার সুযোগ দেবে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনর্বাসন নীতিমালায় ক্ষতিগ্রস্তদের অংশিদারীত্ব ও মালিকানা বিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে এসডিজির এক নম্বর এজেন্ডা 'নো পোভার্টি' লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হবে। সৃষ্ট বৈষম্যের থাবায় দেশে এখন কোটিপতির সংখ্যা ৮৪ হাজার। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় দুর্নীতির বিষ বৃক্ষ উপড়ে ফেলার যুদ্ধ ঘোষণার প্রত্যয়ন এ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে দৃশ্যমান। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ নৌ বাহিনী পরিচালিত আরেকটি মেগা প্রকল্প পায়রা সমুদ্র বন্দর আবাসন ও সমন্বিত পুনর্বাসন কর্মযজ্ঞে একই জয়ের সুর। প্রকল্পটি ২টি পর্যায়ে বিভক্ত। ফেইজ-১ ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ কাজ ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়ে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত চলবে। ফেইজ-২-এ ভাঙ্গা হতে যশোর পর্যন্ত জানুয়ারি ২০২০ এ শুরু হয়েছে যা ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। উভয় ফেইজে মোট ৭৯৯.৭৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পে মোট ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ১২,৬২৩ জন। যাদের মধ্যে ১৮০৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ঝুঁকিপূর্ণ ও দরিদ্র। এদেরকে জীবিকা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন আওতায় কারিগরি ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উভয় ফেইজে মোট ৬৫৭ কোটি টাকা রিসেটেলমেন্ট বাজেট বরাদ্দ রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা কৃষি জমি, বসতভিটা, বাণিজ্যিক, শিল্প জমি, জলাশয়ের ক্ষতি, শিল্পকারখানা, গাছপালা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ পাবে।

● **লেখক**
কলামিষ্ট, উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংগঠক

পুনর্বাসন কার্যক্রমের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব প্রকৌশলী গোলাম ফখরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন সিএসসি'র ভারপ্রাপ্ত প্রধান সমন্বয়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাকির আহমেদ, এনডিসি, পিএসসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডরপ এর চেয়ারম্যান সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও মুক্তিযোদ্ধা মো. আজহার আলী তালুকদার।

করোনার যাঁতাকলে জীবন ও মূল্যবোধ

এ বি এম তাজুল ইসলাম

যে কোনো সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা মহামারি হয়ে উঠলে। বর্তমানে করোনা ভাইরাসও বিশ্বব্যাপি এক মহামারি। পৃথিবী জুড়ে মানুষের জীবন, জীবিকা ও মনোজগতে তাণ্ডব ঘটিয়ে করোনা এখন আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে একে ঘরে ঢুকানোর বিষয়টা নির্ভর করছে আমাদের সচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি মানা না মানার উপর।

প্রাচীন যুগে মানুষ যখন থেকে শিকার করে জীবন নির্বাহ করা শুরু করল মূলত তখন থেকেই সংক্রামক রোগের যাত্রা শুরু। কারণ, বেশির ভাগ সংক্রামক রোগের জীবাণুর উৎস হলো বন্য প্রাণি। প্লেগ, স্প্যানিশ ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু, সার্স, মার্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সর্বশেষ নোভেল করোনা ভাইরাস-এ সবই প্রাণি থেকে মানুষে বিস্তারকৃত রোগ।

করোনা আমাদের মৌলিক জায়গায় হাত দিয়েছে। মানবিকতা, স্নেহ-ভালোবাসা, সচেতনতা, দায়িত্বশীলতার পরীক্ষায় ফেলেছে বহুরূপী এই ভাইরাস। রাজা, উজির, ধনী, গরিব, শাসক-শোষক, শাসিত, শোষিত যে যা-ই হই, করোনা কাউকে ছাড় দিচ্ছে না।

মহামারি সহানুভূতিকেও হত্যা করে। করোনা আমাদের সমাজের স্বার্থপরতার কিছু চরম চিত্রকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। করোনার ভয়ে মাকে সন্তানদের জঙ্গলে ফেলে আসা, করোনা সন্দেহে ভাড়াটিয়াকে বাসা থেকে বের করে দেওয়া, হাসপাতোলে ঘুরে ঘুরে ভর্তি হতে না পেরে মৃত্যুর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, হাসপাতালে স্বজনের লাশ রেখে পালিয়ে যাওয়া, গোরস্থানে লাশ দাফনে বাধা দেওয়া ইত্যাদি আরও কত কি । এসব ঘটনা একটা সংকেত যে, সমাজের নৈতিক বিষয়গুলো ভেঙ্গে পড়েছে, মূল্যবোধে চিড় ধরেছে। ভয় আর আতংক পরম সম্পর্কগুলোর সুতা ছিঁড়ে দিচ্ছে । করোনার আগে কি কেউ আমাদের ক্ষয়ে যাওয়া মানসিকতার এমন অমানুসিক চিত্র কল্পনা করেছিল? মানুষ হিসেবে, পরিবার, সমাজের একজন হিসেবে আমরা কি আমাদের সেরাটা দেব, নাকি আগের চেয়ে খারাপ করে ফেলব এখন চলছে সেই পরীক্ষা। পারস্পরিক সহমর্মিতা ছাড়া, সাহায্য ছাড়া মানুষ টিকতে পারে না। একা মানুষ একটা ছোট প্রাণীর চেয়েও অক্ষম।

করোনার বিপদের প্রকৃতিটা হলো, শুধু আমি সুস্থ থাকলে হবে না, তোমাকেও সুস্থ থাকতে হবে। না হলে তোমার ভাইরাস দশজন ঘুরে আমার দুয়ারেও কোনো না কোনোভাবে আসবে। এখন আপন হাতকেও বিশ্বাস নেই। নিজের হাত নিরাপদ রাখা আর অন্যের হাত থেকে দূরে থাকা ছাড়া যেন উপায় নেই।

করোনাকে প্রথমে স্বাস্থ্যসমস্যা হিসেবেই ভাবা হয়েছিল, পরে দেখা গেল করোনা হাজারো মানসিক জটিলতাকেও বাড়াচ্ছে যার প্রভাব এখন পরিবারের শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক সবার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। জীবনের সব ক্ষেত্রকেই সংক্রমিত করেছে করোনা যার প্রভাবে সমাজে অন্যায়, অস্থিরতা ও নৈরাজ্য বাড়ছে, অভাব বাড়ছে, আয় কমে বহু মানুষের অর্থনৈতিক স্ট্যাটাস পরিবর্তন হয়ে মধ্যবিত্ত নেমেছে নিম্ন-মধ্যবিত্তে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিণত হয়েছে নিম্নবিত্তে আর আগে থেকেই দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চলা প্রান্তিক মানুষগুলোর ঠেকানো পিঠ এখন সেঁদিয়ে গেছে দেয়ালে।

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্য মতে, করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরুর আগে যাদের গড় মাসিক আয় ছিল ১৪ হাজার ৫৯৯ টাকা, মার্চ মাসের শেষে তা নেমে আসে ৩ হাজার ৭৪২ টাকায়। অর্থাৎ গড় আয় ৭৫ ভাগ কমে গেছে। আয়ের ভিত্তিতে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৮৯ ভাগই চরম বা হতদরিদ্র স্তরে নেমে গেছে। এ কারণে আগের তুলনায় চরম দারিদ্র্যের সংখ্যা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনাভাইরাসের কারণে ৭২ শতাংশের কাজ কমে গেছে। করোনাকালীন তাদের গবেষণায় দেখা যায় ১৪ ভাগ মানুষের ঘরে কোনও খাবার ছিল না। ২৯ ভাগ মানুষের ঘরে খাবার ছিল এক থেকে তিন দিনের। সরকারের জরুরি ত্রাণ পেয়েছে মাত্র চার শতাংশ মানুষ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) আয় ব্যয়ের জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ছিল সাড়ে ২৪ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে শেষে অনুমিত হিসেবে তা নেমে এসে দাঁড়ায় সাড়ে ২০ শতাংশে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিডিপি) গত ৭ জুন ২০২০ এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে জানায়– করোনাভাইরাসের কারণে দেশে দারিদ্র্যের হার ৩৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। করোনাভাইরাসের

প্রভাবে বাংলাদেশের নিম্নবিত্তের আয় ৭৫ ভাগ কমেছে, বেড়েছে চরম দারিদ্র্যের হার। এগুলো হলো পরিসংখ্যান যা জীবনের উপর দাঁড়িয়ে তৈরি হয়ে থাকে। তাই শুধু হাত ধুয়ে আর মাস্ক পরে করোনা থেকে রেহাই পেলেও করোনা পরবর্তী জীবনে অর্থনৈতিক মহামারি থেকে সহজে রেহাই মিলছে না।

করোনাকালে কোথায় মানুষ বেশি স্বস্তিতে আছে? গ্রামে না শহরে, রাজধানী না মফস্বলে? বেশির ভাগ মানুষই মনে করে, গ্রাম বেশি নিরাপদ তাই জীবনের মায়ায় করোনা নিয়ে আতঙ্কের শুরুতেই হাজার হাজার মানুষ গ্রামে ফিরে গেছেন। গ্রামে ফেরা মানুষের স্রোতে এখন আরও অনেক বেশি পার্থক্য। প্রথমে মানুষ শহর ছেড়েছে শুধু জীবনের মায়ায় আর এখন ছাড়ছে জীবিকায় টান পড়াতে। প্রতিদিন শত শত মানুষ শহর ছাড়ছে। গ্রামের পথে পাড়ি দিচ্ছে এ শহরে টিকতে না পাড়া মানুষগুলো। তবে এই মানুষদের বেশির ভাগ নিম্নআয়ের দরিদ্র মানুষ। এখন রাজধানী ত্যাগ করাই যেন নিম্ন আয়ের মানুষের বেঁচে থাকার প্রাথমিক উপায়। গ্রামে সম্পদ নেই, সম্পদ সব শহরে জমা। অথচ সেই শহর ছেড়ে মানুষ গিয়েছে গ্রামে, এভাবে করোনার তাড়া চলতে থাকলে আরও অনেকে যাবে। আগে শহুরে মানুষের গ্রামে যাওয়া ছিল বছর শেষে বেড়াতে যাওয়া আর কিছু ছিল ঈদের যাওয়া, আর এখন চলছে তাড়া খেয়ে 'দেশে ফেরা'।

শহরের লোক গ্রামে পালাতে পারেন, কিন্তু গ্রামের কৃষকের কোথাও পালানোর জায়গা নেই। মাটি কামড়ে তাঁকে ফসল ফলাতে হবেই যে ফসলে তাঁর জীবন বাঁচবে, শহুরে মানুষের খাবারের যোগানও দিতে হচ্ছে তাকেই। আহা! একদিন যে মানুষগুলো গ্রামের সবুজ মাঠ, মেঠো পথ, ধুলা-বালিকে পেছনে ফেলে জীবিকার টানে গ্রাম ছেড়ে শহরবাসী হয়েছে আজ সেই শহর থেকে আশ্রয়হীন হয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে তাঁর শেকড়ের কাছে। কারণ, এই শহর আজ বড় অচেনা। এত বিপুল মানুষকে গ্রামগুলো 'অ্যাবজর্ব' করে নিল, আশ্রয়ের সুযোগ করে দিল, সেটা খুবই খেয়াল করার দিক। প্রায় চার মাস হতে চলল, এখন পর্যন্ত শহরের চেয়ে গ্রামে অভাবের পীড়ন কম কারণ, মাঠে ফসল আছে, ঘরে ধান আছে, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি আছে, আর যাই হোক মানুষকে অন্তত না খেয়ে থাকতে হচ্ছে না। এই করোনাকাল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কৃষি, কৃষক ও ফসলের গুরত্ব কতটা। কোন ব্যবস্থা মানুষকে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা দিতে সক্ষম আর কোন ব্যবস্থা সবচেয়ে অকেজো।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র (WHO) মতে করোনা পরবর্তী সময়ে বিশ্বে চরম খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে এবং এর ফলে প্রায় ৩ কোটি লোকের মৃত্যু হতে পারে যা করোনার চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশের সরকার নিজ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রতি ইঞ্চি আবাদি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বারবার তাগিদ দিচ্ছেন– যেন চাষযোগ্য কোনো জমি অনাবাদি না থাকে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সহ সরকারী, বেসরকারী সব পর্যায় থেকে কৃষকদের উন্নত কলাকৌশল ও যথাযথ কারিগরী পরামর্শ প্রদানের জন্য কৃষি বিজ্ঞানীগণ কৃষকদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গ্রামে বসবাস না করলেও আমাদের প্রায় সবারই কম বেশি কৃষি জমি আছে যা হয়ত এতকাল অনাবাদিই থেকেছে কিন্তু এখন এই ক্রান্তিকালে আমাদের জমিগুলো যথাযথ ব্যবহার করা উচিত। যদি কৃষি জমিগুলো নিজেদের তত্ত্বাবধানে চাষাবাদ করা সম্ভব না হয় তাহলে গ্রামে বসবাসকারী নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী কাউকে জমিগুলো বর্গা চাষের জন্য দিতে পারি আর তাও সম্ভব না হলে গ্রামের কিছু ভূমিহীন বা গরিব কৃষককে বিনা মূল্যে ৬ মাস বা ১ বছরের জন্য আমাদের জমিগুলো ব্যবহার করতে দিতে পারি। এর ফলে ঐ দরিদ্র কৃষকের উপার্জনের একটা ব্যবস্থা হবে যা পরোক্ষভাবে তাদেরকে দান করারই নামান্তর।

দুর্যোগ যেমন আমাদের সবচেয়ে খারাপটাকে বের করে আনে, তেমনি সবচেয়ে ভালোটাকেও জাগিয়ে দিয়ে যায়। বিশ্বব্যাপি লকডাউনের এই সময়ে বিপন্ন প্রকৃতি যেমন পেয়েছে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার কিছু সুযোগ তেমনি শিল্পায়নের প্রতিযোগিতায় ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবী নামক গ্রহটাও পেয়েছে নির্মল আলো বাতাসে নিজেকে জুড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ। এ সময়ে পারিবারিক বন্ধনের সুতাগুলো মনে হয় কিছুটা পোক্ত হয়েছে, গৃহস্থালি কাজের সহযোগিতা দিয়েই সেটা শুরু। পরিবারের নিরাপত্তার কারণে করোনার শুরুতেই অধিকাংশ পরিবার গৃহকর্মীকে দিয়েছে ছুটি। গিন্নির প্রতি সহমর্মী হয়ে ভালোবাসা ও সক্ষমতার প্রমাণ দিতে গিয়ে ছেলেরা নিজেদের চওড়া কাঁধে তুলে নিয়েছে গৃহকর্মীর কাজের কিছু ভাগ। ঘর মোছা দিয়ে শুরু হলেও দিনে দিনে যোগ হচ্ছে নতুন কিছু। করোনাকাল যত প্রলম্বিত হচ্ছে চওড়া কাঁধ তত সরু হচ্ছে। মৃদু স্বরে গৃহকর্মী নিয়োজিত করার কথা উঠালেই অপর পক্ষ থেকে শুনানো হয় করোনার সাবধান বাণী। ওগো দয়াময় এই করোনা তুমি আকাশে উঠিয়ে নাও, আমাদের মুক্ত কর।

চার্লি চ্যাপলিনের সিটি লাইটস ছবির একটি পরিস্থিতির বিবরণ– এক লোক খেলতে খেলতে একটা ছোট হুইসেল বাঁশি গিলে ফেলেন এবং এরপর একের পর এক হেঁচকির শিকার হন। বাঁশিটি তাঁর গলার ভেতর আটকে থাকা অবস্থায় হেঁচকি শুরু হলে বাঁশির দরজায় বাতাস লাগে। আর গলার ভিতর সেটা বেজে উঠে। এ রকম হাস্যকর অবস্থায় লোকটা যতবার হেঁচকি দেন, ততবার তার পেটের ভেতর থেকে অদ্ভুত এক হুইসেল বেজে উঠতে থাকে। বিব্রত বেচারা মরিয়া হয়ে শব্দটি লুকাতে চান, কিন্তু খুঁজে পান না কী করবেন। তিনি বোঝাতে চান যে, যেটা বাজছে সেটা তার শরীরের অংশ না, ওটা বহিরাগত জিনিস। কিন্তু তখন তো আর জিনিসটা তার নিয়ন্ত্রণে নেই। ফলে শ্বাস নিলেই বাঁশিটা বাজছে। এদিকে শ্বাস না নিয়েও তো থাকা যাচ্ছে না। করোনা নিয়ে আমাদের পরিস্থিতি এখন এমন। করোনা যদি ঐ বাঁশির মত নিয়তির অংশ হয়ে যায় তাকে আর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না।

জীবন আগে না জীবিকা আগে এটাই এখন সময়ের বড় প্রশ্ন। জীবন ও জীবিকা একে অপরের পরিপূরক, তবে জীবন না থাকলে জীবিকাও শেষ। মহামারির এই সময়ে জীবন ও জীবিকার শর্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। কারণ, প্রত্যেক মানুষই যখন সম্ভাব্য জীবাণুবাহী, তখন এটাই বাঁচার একমাত্র কৌশল।■

● সহকারী কর্মকর্তা-কৃষি

অরুণ আর হাত বাড়িয়ে দেবে না

জাকির হোসেন

৩০ জুন রাত সাড়ে এগারোটার কিছু পর প্রশিক্ষণ বিভাগের সমন্বয়কারী নজরুল ফোন করে জানালো কুমিল্লার এক গার্ড সুপারভাইজার মারা গেছে। নজরুল নাম বলতে পারছিলো না। ওর সাথে কথা বলতে বলতেই মোবাইলের স্ক্রিনে কর্মসূচি সমন্বয়কারী লিটনের ম্যাসেজ ভেসে উঠলো। একই সংবাদ। বুঝতে পারলাম নজরুল যার কথা বলছিলো সে অরুণ চন্দ্র দাস, কুমিল্লা মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের গার্ড সুপারভাইজার। অরুণ চন্দ্রকে আমি অরুণ বলেই সম্বোধন করতাম। ও ছিলো হাস্যজ্জল, দায়িত্বশীল একজন মানুষ। আমি যতোবার কুমিল্লা গিয়েছি ততোবার ওকে গেটের সামনে পেয়েছি। অরুণ বরাবরই সালাম দিয়ে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতো। হ্যান্ডশেক করে আমি ওর কুশলাদি জিজ্ঞেস করতাম, ও হাসি মুখে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতো। অরুণের সুপারভাইজারের কাছ থেকে জেনেছি, সহকর্মীদের সাথেও ওর ছিলো অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক। সবাই ওকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো।

অরুণের বাড়ি কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার খৈচারা গ্রামে। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ১৯৮৬ সালে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কর্পোরাল ক্লার্ক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে ও। একুশ বছর চাকরি করার পর ২০১৬ সালে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে

অরুণ চন্দ্র দাস

যোগদান করে বুরো বাংলাদেশে। বিগত চার বছরে যতবার কুমিল্লা গিয়েছি ততোবারই দেখা হয়েছে ওর সাথে। করোনাকালে আমরা সবাই যখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তখন অরুণের মতো নিষ্ঠাবান কর্মীর এভাবে চলে যাওয়ার খবর আমাকে অনেক বেশি ব্যথিত করেছে। আমি হয়তো আবার কুমিল্লা যাবো, কিন্তু হ্যান্ডশেক করার জন্য অরুণ আর হাত বাড়িয়ে দেবে না!

অরুণ মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছে। তাদের জন্য আমার অকৃত্রিম ভালোবাসা। শুনেছি, শুধু কর্মস্থলেই নয়, স্বামী ও পিতা হিসেবেও অরুণ ছিলো দায়িত্বশীল। কর্মজীবনে অর্জিত ও সঞ্চিত সবটুকু অর্থ খরচ করে কুমিল্লার রাজেন্দ্রপুরে বাড়ি বানিয়েছিলো। তিন সন্তানের লেখাপড়ার খরচও বহন করছিলো অকুণ্ঠ চিত্তে। অরুণের বড় ছেলে কুমিল্লা সরকারি কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগে অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র, ছোট ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে আর মেয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। আমি অরুণের তিন সন্তানের শিক্ষা জীবনের

সাফল্য কামনা করছি। আশা করি, শিক্ষা জীবন শেষে ওরা মানুষের মতো মানুষ হবে, বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করবে। বুরো বাংলাদেশ ওদের পাশে থাকবে, কারণ এটা আমাদের দায়িত্ব। অরুণের পরিবারের একজন চাইলে বুরো বাংলাদেশে চাকরিও পাবে।

অরুণের পরিবার জানিয়েছে, ২০১২ সালে ও যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো, সাথে মাইগ্রেনের সমস্যাও ছিলো। মাঝের বেশ কয়েক বছর সুস্থ থাকলেও শেষ পর্যন্ত হেরে যায় এই ব্যাধির কাছে। অরুণকে চাপা স্বভাবেরই বলতে হবে। কারণ নিজের অসুস্থতার কথা ও কখনো প্রকাশ করেনি। আমাদেরকেও জানায়নি। জানলে আমরা ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতাম। সঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসা হলে অরুণকে হয়তো এভাবে চলে যেতে হতো না। আসলে অরুণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যসব বাবা'র মতোই। নিজেকে উজার করে দিয়ে পরিবারের জন্য সব কিছুই করবে, কিন্তু নিজে ক্ষয় হয়ে যাবে নিভৃতে। শুধু বাবারাই কেন! এ অঞ্চলের মায়েরাও তো তেমনই। উৎসব-পার্বণে সাধ্যের মধ্যে সন্তানদের জন্য সবকিছুই করবে, শুধু ভুলে থাকবে নিজের কথা! এদেশের মা-বোনেরা এতোটাই চাপা স্বভাবের যে, নিজের অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-যন্ত্রণাও চেপে রাখে পরিবারের সুখের কথা ভেবে। স্তন ও জরায়ু ক্যান্সার এবং এমনকি এপেন্ডিসাইডের ব্যথার কথাও লুকিয়ে রাখে অনেকে। কিন্তু পরে এই চেপে রাখা ব্যাধিগুলোই ধরা দেয় প্রাণঘাতী হয়ে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাপোর্ট স্টাফরাও নিজেদের অসুবিধার কথা ঊর্ধ্বতনদের বলতে চায় না। তারা হয়তো ভাবে, চাকরি করি, বলে লাভ নেই; নিজের সমস্যা নিজেকেই সমাধান করতে হবে। কিন্তু বুরো বাংলাদেশের মতো একটি মানবিক সংস্থা, যার যথেষ্ট লোকবল রয়েছে, আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে, দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক রয়েছে চাইলেই তার কর্মীদের জীবন-মরণ প্রশ্নে পাশে দাঁড়াতে পারে, চিকিৎসা সহায়তা দিতে পারে। সময় মতো চিকিৎসা কিংবা আর্থিক সহায়তা পেলে অনেক জটিল রোগ থেকেও আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। তাছাড়া ইদানিং স্বাস্থ্য সেবা নিতে গিয়েও অনেকে প্রতারিত হয়। প্রতিষ্ঠান পাশে থাকলে সে আশঙ্কাও কম থাকে বলে মনে করি।

অরুণ চিকিৎসার জন্য কুমিল্লা সিএমএইচে ভর্তি হয়েছিলো। তার চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে পরিবারকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের জানালে আমরা অনেক কিছুই করতে পারতাম। নজরুলের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি, আমাদের সাপোর্ট স্টাফরা নিজেদের সমস্যার কথা মুখ ফুটে বলতে চায় না এবং নিজেরাও সহজ সমাধান করতে পারে না, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আমাদেরও উচিত, যে যেখানে

মো. কামাল উদ্দীন

সেলিম হোসেন

দায়িত্বে রয়েছে বিশেষ করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইনচার্য, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ও প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন বিভাগসহ সকল বিভাগীয় প্রধানদের সাথে কর্মরত ম্যাসেঞ্জার, নিরাপত্তা প্রহরী, ক্লিনার, মালি, ইলেক্ট্রিসিয়ান ও রান্নার কাজে সম্পৃক্ত কর্মীদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা ও স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেয়া। কর্মীরা হয়তো বলতে চাইবে না, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটালে এক সময় তারা নিজ থেকেই সমস্যার কথা বলতে শুরু করবে। সময় মতো সঠিক পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পেলেও অনেকে উপকৃত হয়। বুরো বাংলাদেশের মতো একটি মানবিক সংস্থার কর্মীদের এ-ধরনের সর্পোট পাওয়া যেমন অধিকার তেমনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব হলো তার সহকর্মীদের খোঁজ-খবর নেয়া ও সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়া।

ঠিক এভাবেই আমাদের অজান্তেই ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৬ জুন মৃত্যুবরণ করেছে কক্সবাজার অঞ্চলের সাতকানীয়া শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মসূচি সংগঠক কামাল উদ্দীন। শুনেছি কামাল করোনায় আক্রান্ত ছিলো। কিন্তু কামালের অসুস্থতার খবরও আমাদের জানা ছিলো না। স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছে সে। কামালের পরিবারের প্রতিও আমার সহমর্মীতা রইলো। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কোন কর্মী মৃত্যুবরণ করলে আমরা তার জন্য বিশেষ আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা রেখেছি। নিয়মিত আর্থিক সুবিধার সাথে কর্মী নিরাপত্তা তহবিলের ৫ লক্ষ টাকা ও অতিরিক্ত আরো ৫ লক্ষ টাকা সংস্থা তার পরিবারকে প্রদান করবে।

আমার এই লেখায় আরো স্মরণ করতে চাই গত ৩০ জুন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত চাঁদপুর অঞ্চলের শাহরাস্তী শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মসূচি সংগঠক সেলিম হোসেনকে। সংস্থার দায়িত্ব পালন শেষে বাসায় ফেরার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয় সে। জীবন-মৃত্যু সৃষ্টিকর্তার হাতে। তারপরও আমরা আমাদের কর্মীদের বরাবরই যানবাহন চালনায় সতর্ক থাকার পরামর্শ দেই। কিন্তু দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনাই। এখানে সেলিম কিংবা আমাদের করার কিছুই ছিলো না। সেলিম সংসার জীবন শুরু করতে পারেনি, তার আগেই তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হলো। সেলিমের পরিবারের প্রতি রইলো আমার গভীর সমবেদনা।

ইতিহাসের নজিরবিহীন এক সংকটকাল অতিক্রম করছি আমরা। চরম এক অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে বিশ্বব্যাপি। কাল কে থাকবে, কে থাকবে না; এমনকি আমি নিজেও থাকবো কিনা তা কেউ জানি না। তাই এই সময়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি মনোযোগী ও যত্নশীল হওয়ার শিক্ষা নিতে হবে। কর্মীরা যাতে নিজের কষ্টের কথা নিঃসংকোচে বলতে পারে সেই পরিবেশ ও সম্পর্ক আমাদের তৈরি করে দিতে হবে। পদবীর দূরত্ব কিংবা উঁচু-নিচু মানসিকতা না রেখে সবাইকে মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে, প্রত্যেকের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে। এতে আমাদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আমাদের, বিশেষ করে বুরো'র সর্বস্তরের কর্মীদের মনে রাখতে হবে পারস্পারিক মমত্ববোধ নিয়ে কাজ করলে কাজের গুণগত মান যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি সংস্থারও উন্নয়ন সাধিত হবে। আমার বিশ্বাস, বুরো বাংলাদেশের দায়িত্বশীল প্রতিটি কর্মী আমার এই কথাগুলোর মর্মার্থ উপলব্ধি করবে এবং তার পাশের কর্মীর প্রতি আরো যত্নশীল ও মানবিক হয়ে উঠবে।■

● লেখক: নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ

কবিতা

করোনা'য় করণীয়
সালেম সুলেরী

জীব নয়, অনুজীব যেন ছাইপাশ,
অবহেলা নয় তাকে– ঘৃণ ভাইরাস।
বাদুড় বা সাপেদের রূপ-স্যুপ থেকে
ব্যাধি হয়ে বাঁধে বাসা, ধরে দেহে জেঁকে।
পেঁচিয়ে বা ঝুলে থাকা হারামের প্রাণি,
কুকুর-শৃগাল-মিউ– মাংসের ঘ্রাণই
মানুষের মুখে-পেটে জীবাণু'র চর–
করোনা'র ভাইরাস কি যে বর্বর।

দেহ থেকে দেহে দেহে চলে দ্রুতচল,
পাশ থেকে শ্বাস থেকে শরীর অতল–
ধরে ফেলে ফুসফুস, নড়ে চড়ে যেই
মানুষের মৃত্যুটা ঘটে নিমিষেই।
বিশে বিষ সাল ধরে চীন থেকে শুরু,
পৃথিবীর পুরো বুক ভয়ে দুরু দুরু।
এর থেকে ওকে ধরে জীবাণু'র খেলা,
জীবনের যমরোগ, লাশ লাশ ভেলা–
সে ভেলায় খেলোয়াড়– তলোয়ার হাতে
রোগ নাকি ভাইরাস– ডাকে সংঘাতে...
'কোভিড উনিশ' নামে পেলো পরিচিতি,
পৃথিবীর প্রায় দেশে বিরাজিত ভীতি।

করোনা কঠিন তবে আছে নিরাময়,
যায় না দু'চোখে দেখা, ছোটে শিরাময়।
মাটিতে বসত তার, বায়ু খোঁজে সখে,
দশটি মিনিট আয়ু হাতে আর ত্বকে।
নয়টি ঘন্টা বাঁচে কাপড়ের ভাঁজে,
বারোটি ঘন্টা বাস ধাতবের মাঝে।
পণ্য বা বস্তুর গা জড়িয়ে থাকে,
সুযোগ পেলেই ঢোকে চোখে-মুখে-নাকে।
দরোজা-জানালা বেয়ে দেহ-মানবের
জীবাণুটা ঢুকে গেলে রূপ-দানবের।
ফাঁদ পেতে চাই তাই জীবাণু'কে খুন–
কি করে শিকার হবে এবার জানুন।

কুসুম গরম পানি, লেবু রসে মাখা,
প্রয়োজন গলাটিকে ভেজা ভেজা রাখা।
শুকনো কণ্ঠনালী করোনার প্রিয়,
মিনিট দশেকে খেলা স্বয়ংক্রিয়–
ফাইব্রোসিসের ফাঁদ ফুসফসে ঢুকে,
দেহকে ফাঁসির স্বাদ দেবে চুকে-বুকে।
তার আগে পানি গেলে করোনা'কে ধরে
পাকস্থলিতে মানে নেবে গহ্বরে–
সেখানে এসিড থাকে– শিকারের বাঘ
জীবাণুকে শেষ করে মেটায় সে রাগ।

করোনা কিভাবে আসে, ঠেকানোটা সোজা,
জীব থেকে জীবাণু'র আসে ঢের বোঝা।
কারো যদি জ্বর থাকে হাঁচি-কাশি বেশি
শ্বাসে ফাঁস, ব্যাথাময়, মাথা-দেহ-পেশী,
তাকে নিয়ে সন্দেহ, পরীক্ষা দ্রুত–
মেশামিশি নিষিদ্ধ– প্রতিশ্রুত।
শীতল ফ্রিজের মাঝে বাঁচে আধা মাস,
সচেতন না হলে তা– 'করোনা নিবাস'!

চাই দেহে ভিটামিন 'সি'-এর শাসন,
মেনে নেবে ফল-জুশ, ধৌত বাসন।
কাপড় কাচার গদে হাতকে শোধন,
মুখ-চোখ তালু পায়ে অজুর বোধন।
স্যাভলন ডেটল বা সাবানের জলে,
দেহকে সতেজ রাখা, তনু টলমলে।
হস্তলেপন-ঘন হ্যান্ড স্যানিটাইজার,
মাস্ক বা মুখোশমুখ বায়ু ছাঁকবার।
হস্তমিলন বা হ্যান্ডশেইক নয়
চুমুমুখ, খোলা বুক নিষিদ্ধময়।

নাকে-মুখে হাত নয়, আঙুল বা নখ
দু'হাত সাবান দিয়ে ধোবা'র ছবক।
কুলি মানে কুলকুজো গার্গেল গলা
পানি পাক নাক থেকে পা-পাতা'র তলা।
ভাজা-পোড়া বাদ থাক– মুখের রোচক
প্রলোভন বাঁধা পাক, লোভের দু'চোখ।

করোনা গরম পেলে শেষ করে জের,
সত্তর ডিগ্রীর সেলসিয়াসের
তাপ পেলে ভাব তার মরি মরি, যাই
করোনা'কে মেরে চুরে মানুষ বাঁচাই।

জীবাণু অস্ত্র যেন সাঁজোয়া বহর,
যুদ্ধের নবরূপ, নীরব নহর।
কর্মের বিপ্লবে কিসের বিকাশ,
গবেষণা চায় নব হিসাবনিকাশ।
সাপফণা, বিষথলি, শেয়াল ইঁদুর,
কুকুর-কামড়, বেজি– বেদনা বিধূর।

মানব জটলা নয়, অকারণ ভিড়
কথা কম– বিড় বিড়, ভাবে গম্ভীর।
বিনোদন-প্রণোদনা অশুদ্ধ নয়–
দেহমন সু-যাপন শুদ্ধতাময়।
পরিবেশ পঁচে গেলে প্রতিভাত পাপ,
প্রকৃতি প্রতীকী রূপে পাপ করে সাফ।
বসবাস উপযোগী সবুজ কোথায়–
অভিশাপ– নতিচাপ যন্ত্রপ্রথায়।

পাচারের টাকা নিয়ে যাবে কতোদূর
'করোনা' বড়ো না তবে জালটি সুদূর।
পণ্য নকল নয় ভোট-নোট সব,
পাপী'র পালকে নাচা রাজ-উৎসব।
'করোনা বর্ষ-স্রোতে' ডোবে ভুল ঢেউ,
মানুষ সীমিত থাকো, অতি নয় কেউ।
'অতি'-সুরে যতি টানো, ক্ষতি ডাকে যম–
রতি-যুগও সতী খোঁজে, খোঁজে সংযম।

জীবাণু'রা আসে যায়, করোনা'ও যাবে,
অশুদ্ধ দেহ-প্রাণ বুঝি শুধরাবে।

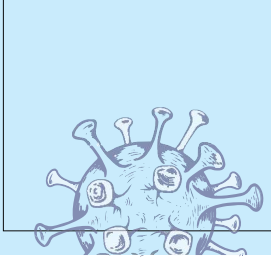
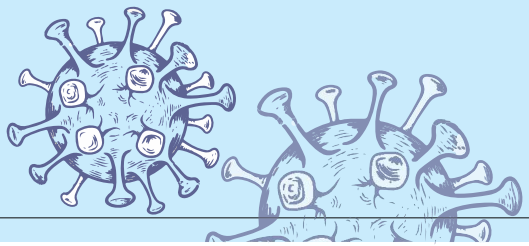
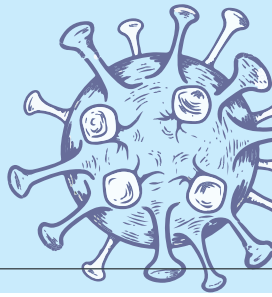

একটা অদৃশ্য মুখ
আসাদ মান্নান

করোনার আগ্রাসনে যেন মৃত কবিতা সুন্দরী–
লাওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে আছে কাফন জড়ানো
পৃথিবীর হিমাগারে; মাছি ওড়ে দুর্গন্ধের টানে–
এতটা চাপের মধ্যে কে সে গায় জীবনের গান
স্বপ্নকে বাঁচাতে গিয়ে আঁকড়ে থাকে মাটির বন্ধন।

কে এসে হাতের কাছে টেনে নেয় আকাশের হাত
যে-চোখে পাখির মতো কোনো ছায়া এখন ওড়ে না
সে-চোখ কবির নয়, এক আত্মবন্দী কয়েদীর
রঙ-রূপ-স্বপ্ন ছাড়া মানুষ কী করে বেঁচে আছে?
কবিতা কবিকে ছেড়ে চলে গেছে অন্যের বাসরে।

এ মনোটোনাস শূন্যতায় হঠাৎ কেন যে আজ
তাকে খুব মনে পড়ছে; আহা! কতদিন মুখোমুখি
দু'জনে বসিনি খুব গাঢ় মৌনতার বেদীমূলে।
শরীরে শরীর জ্বেলে বাসনার মোমের আলোয়
জড়িয়ে ধরিনি তাকে কতদিন কতরাত ধরে।

মৃতের জানাজা শেষে ইচ্ছে হয় তাকে নিয়ে একা
কোথাও অনেক দূরে উড়ে যাই কুয়াশা কুটিরে
অন্ধকারে নক্ষত্রবীথির আলো কুড়োতে কুড়োতে;
কবিতাকে খুঁজতে গিয়ে বার বার কেন খুঁজে পাই
একটা অদৃশ্য মুখ– যেন টাটকা পূর্ণিমার চাঁদ।

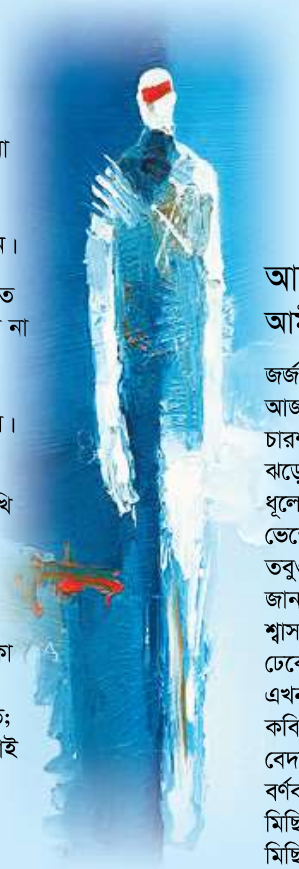

কোভিডকালের প্রেম
গোলাম শফিক

ট্রিমারের সোহাগে, দন্তরাজ চিরুনির আদরে
সারাটা সকাল কাটলাম এই দাড়ি গোঁফ।
অতঃপর আফটার শেভ, সুগন্ধি ক্রিমের পরশে
কবির বেদির সাথে আরশিতে মিলিয়ে নিই মুখ।

অধুনা এসবের প্রয়োজন ভুলে গেছে মানুষ
মুখোশের আড়ালে ফ্রেঞ্চকাট, সুন্নতি শ্মশ্রু
কিংবা নায়ক-মহানায়কের সুরত ঢাকা পড়ে আছে।
তোমার জেল্লাদার চেহারাও
রাহুর গ্রাসের মতো কবেই গিলেছে মুখোশ
আমি তবু মনে রাখি একমুখী যোগাযোগ,
কখনো তোমার চাঁদমুখ থেকে সরে গেলে মেঘ
নিশ্চয় দেখে নেবো চাপা পড়া নরম ঘাসের গুচ্ছ
দীর্ঘদিন সূর্যের আলো না পড়ে সাদা হয়ে আছে।
তবু ভাগ্য অনুকূল, কোনো এলান হয়নি জারি–
চোখেও মুখোশ পরে হাঁটতে হবে,
অন্ধের মতো সাদাছড়ি হাতে।

আমি একমুখী যোগাযোগের কথা ভেবে
যখনই মুখোশ সরাই, তুমি বলো– রে রে পরে নাও
সবাই বলে, পরে নাও
সেনা ও সান্ত্রী বলে, পরে নাও পরে নাও।
ভাবছি কেবলই মায়ের কথা,
মা বেঁচে থাকলে সারাদিনই আমাকে গাইতে হতো গান,
মা তোর বদনখানি ঢাকা পড়লে আমি নয়ন জলে ভাসি।

আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না
আমীরুল আরহাম

জর্জ, তোমার শ্বাসরুদ্ধ নিঃশ্বাসের ঝড়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো
আজ সকালে
চারশ বছরের ঈষাণ কোণে জমা মেঘ ভরিয়ে তুলছে আকাশ
ঝড়ের উথাল ঢেউয়ে ছাপিয়ে উঠছে পৃথিবী
ধূলো উড়ছে পথে খসে পড়ছে পাতা
ভেঙ্গে পড়ছে শত বছরের বৃক্ষরাজ
তবুও জানালা খুলে রেখেছি আজ
জানালার ওপারে অসংখ্য জর্জ
শ্বাসরুদ্ধ বাকরুদ্ধ গুলিবিদ্ধ জর্জ
ঢেকে আছে মোলায়েম সবুজ ঘাস, স্নোবল ফুল
এখন চশমা পরি, সেদিন খোলা চোখে দেখেছি
কবিতায় লাথি, কথায় লাঠি,
বেদনার আর্তনাদে গুলি
বর্ণবাদ আর বৈষম্যের ধূলো ওড়া ঘূর্ণিঝড়
মিছিলে মিছিলে বিচারহীন গোলাগুলি
মিছিল থেমে ছিল পুলিশের দেয়ালে
দেয়ালে হেলান দিয়ে অসংখ্য দেয়াল
বাকরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ভরা জমাট জল
উপচে পড়েছে পৃথিবীময় প্রবল স্রোতে
শ্যাওলা বিবর্ণ দেয়ালে দেখছি আজ অনিবার্য ধস
সাদা কালো ফুলে ফুলে অন্ধকারে
জেগে উঠছে নতুন সকাল 'ব্লাক লাইভস ম্যাটার'

জর্জ, প্লিজ! আমাকে ছাড়ো আমাকে মুক্তি দাও, প্লিজ!
আমার মুষ্ঠিবদ্ধ হাত জেগে উঠেছে আজ
আমাকে ছাড়ো-মুক্তি দাও!

মা! মাগো! মা আমার!
আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না!

বেঁচে আছি দড়াবাজিকর
আমিনুল গনী টিটু

এ এক উদ্ভট সময়, দালান কোঠা কারারুদ্ধ
সীমিত বেঁচে আছি শূন্যে ঝুলানো দড়ির ভারসাম্যে,
এ এক ঘোর সংকট, বিশ্বাসের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলে বিভ্রান্তি–
মানুষের মাথায় ভয়ের বোঝা, হার্ড ইমিউনিটি এখন জীবন দাতা!
কে যাবে কে থাকবে আমাদের কোনো চয়েস নেই,
ক্ষয় হচ্ছি ভেতরে ভেতরে–
দড়ির উপর পা টালমাটাল,
এ কথা সত্য আমার যাবার তাড়া নেই,
ভাবছি পায়ের ভারসাম্য, দুলে ওঠা দড়ির কথা।

করোনা থেকে বাঁচতে কি করবেন কি করবেন না

রাশেদ আহমেদ

দৃশ্যমান শত্রুর সাথে লড়াই করা যায়। অদৃশ্য শক্তির সাথে লড়াই করা কঠিন। আমরা এমনই এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে কঠিন লড়াইয়ে আছি। মানুষ, জাতি, রাষ্ট্র সবাইকে লড়তে হচ্ছে। করোনা শত্রুকে মারার এখনও কোন অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি চিকিৎসা বিজ্ঞান। তাই আপাতত নিজেদের প্রতিরক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাসকে মারা যায় না, সে শুধু পারে নিজে ধ্বংস হতে। করোনা জীবন্ত কোন প্রাণী নয়, এটি প্রোটিনের অণু, যা আবার চর্বি দিয়ে মোড়ানো।

■ এই ভাইরাস আমাদের নাক-চোখ-মুখের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে গেলে নিজের জেনেটিক কোড বদলে ফেলে শক্তিশালী ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

■ সাবান ও ডিটারজেন্ট ভাইরাসটি থেকে মুক্ত হবার সহজ উপায়। সাবান ও ডিটারজেন্ট মূলত যে কোনো স্থানের তেল বা চর্বি সরাতে পারে। তেল বা চর্বি সরানোর উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তত টানা ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে হয় যাতে করে প্রচুর ফেনা তৈরি হতে পারে। এর ফলে ভাইরাসের উপরের চর্বির স্তর ভেঙে গিয়ে পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে যায়।

■ গরম তাপমাত্রা চর্বি গলাতে কার্যকর। এজন্যে হাত বা কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে অন্তত ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি ব্যবহার করা উচিত। এ ছাড়া, সাবান ব্যবহারের ক্ষেত্রে গরম পানি ঠান্ডা পানির চেয়ে বেশি ফেনা তৈরি করতে পারে বলে ভাইরাসটিকে আরো দ্রুত অকার্যকর করতে পারে।

■ অ্যালকোহল কিংবা অন্তত ৬৫% অ্যালকোহলের মিশ্রণ যে কোনো ধরনের তেল অথবা চর্বি ভাঙার জন্য উপযুক্ত। ভাইরাসের শরীরের বাইরের চর্বির স্তর ভাঙতে অ্যালকোহলের মিশ্রণ অত্যন্ত কার্যকর একটি উপায়।

■ এক ভাগ ব্লিচিং পাউডার ও পাঁচ ভাগ পানির মিশ্রণ সরাসরি প্রয়োগে প্রোটিন ভেঙে যায়। তাই এই মিশ্রণ ভাইরাসটিকে ভিতর পর্যন্ত গলিয়ে ধ্বংস করতে পারে।

■ সাবান, অ্যালকোহল এবং ক্লোরিন যদি অক্সিজেন চালনা করা পানির (অক্সিজেনেটেড ওয়াটার) সঙ্গে ব্যবহার করা হয় তবে তা অপেক্ষকৃত দীর্ঘ সময় ধরে ভাইরাসের কার্যক্ষমতা ঠেকাতে সাহায্য করে। এর কারণ অক্সিজেন চালনা করা পানিতে থাকা পারঅক্সাইড ভাইরাসের প্রোটিনকে গলিয়ে ফেলতে পারে। এটি বিশুদ্ধ হলে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে ত্বকের জন্য সুবিধাজনক নয়।

■ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে যা ব্যবহার করা হয় তা দিয়ে ভাইরাস থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব না। ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার মতো জীবন্ত প্রাণী নয়। যা জীবন্ত নয় তাকে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে হত্যা করার প্রশ্ন নেই। তবে আগে যা যা উপায় বলা হলো সেসব অনুসরণ করে ভাইরাসকে ভেঙে ধ্বংস করা সম্ভব।

■ ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত পোশাক, কাপড় বা চাদর ঝাড়া দেয়া যাবে না। কাপড় ঝাড়লে তা থেকে নিঃসৃত ভাইরাস কোথাও পড়লে সেখানেই আটকে থাকে। কাপড় বা সমধর্মী জিনিসে ৩ ঘণ্টা, তামা বা কাঠে ৪ ঘণ্টা (যেহেতু তামা নিজেই জীবাণু ধ্বংস করতে পারে এবং কাঠ ক্রমাগত আর্দ্রতা হারাতে থাকে), হার্ডবোর্ডের উপরে ২৪ ঘণ্টা, ধাতব জিনিসে ৪২ ঘণ্টা এবং প্লাস্টিকে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত ভাইরাসটি টিকে থাকতে পারে। ভাইরাস আছে এমন কিছুকে ঝাড়া দিলে বা তার উপরে পালকের ডাস্টার ব্যবহার করলে ভাইরাসের অণুগুলো বাতাসে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত ভাসতে পারে এবং মানুষের নাকে ঢুকে যেতে পারে।

■ ভাইরাস অণুগুলো ঠান্ডা আবহাওয়ায়, এমনকি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ি বা গাড়িতে অত্যন্ত ভালোভাবে টিকে থাকতে পারে। বেশি কার্যকর থাকার জন্য ভাইরাসটির আর্দ্রতা এবং অন্ধকারের উপস্থিতির প্রয়োজন পড়ে। এ কারণে একদিকে শুকনো বা কম আর্দ্রতাবিশিষ্ট আবহাওয়া, অন্যদিকে গরম এবং উজ্জ্বল পরিবেশে ভাইরাসটি দ্রুত ধ্বংস হয়।

■ অতিবেগুনী রশ্মি (UV) ভাইরাসটিকে তার প্রোটিন ভেঙে যেকোনো কিছুর উপর থেকে ধ্বংস করতে পারে। এভাবে একটি মাস্ককে ব্যবহারের পর ভাইরাসমুক্ত করে আবারো ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু ইউভি লাইট যেহেতু ত্বকের কোলাজেন ভেঙে দেয় তাই মুখে বলিরেখা থেকে শুরু করে ত্বকের ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে।

■ ভাইরাসটি সুস্থ এবং স্বাভাবিক ত্বকের ভিতরে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে না।

■ করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে ভিনেগার কার্যকর নয় কারণ ভিনেগার প্রোটিন ধ্বংস করতে পারে না।

■ স্প্রিট ভাইরাসটি ধ্বংস করতে কার্যকর নয়। ভাইরাসটি ধ্বংস হতে কমপক্ষে ৬৫% অ্যালকোহল দরকার।

■ করোনা ধ্বংস করে অ্যালকোহলসমৃদ্ধ এমন কিছুর কথা ভাবলে একমাত্র বলা যেতে পারে কোনো কোনো লিসটারিনের (মাউথ ওয়াশ) কথা যাতে ৬৫% অ্যালকোহল থাকে। তবে বেশিরভাগ লিসটারিনে থাকে ২০% থেকে ৩০% অ্যালকোহল যা ভাইরাসটি ধ্বংসে কার্যকর নয়।

■ বদ্ধ স্থানে ভাইরাসটির প্রকোপ বেশি হবে। উল্টোদিকে উন্মুক্ত এবং বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে ভাইরাসের উপস্থিতি কম হবে।

■ এটা অবশ্য অনেকবার বলা হয়েছে, তবু আরেকবার বললে ক্ষতি নেই যে নাক, খাবার, দরজার লক, যে কোনো সুইচ, রিমোট কন্ট্রোলার, সেল ফোন, ঘড়ি, কম্পিউটার, টেবিল ও টেলিভিশন জাতীয় জিনিস ধরার আগে ও পরে হাত ধোয়া জরুরি। ওয়াশরুম ব্যবহার করলে হাত তো ধুতে হবেই।

■ বারে বারে ধোয়া হাত ভালোমতো শুকাতেও হবে। কারণ ত্বকের যে কোনো ফাটলে ভাইরাস লুকিয়ে থাকতে পারে। ত্বক আর্দ্রতাকারী লোশন বা ক্রিম যত ভারি ও তৈলাক্ত হয় তত ভালো।

■ হাতের নখ ছোটো করে কেটে রাখা উচিত যেন তাতে ভাইরাস ঢুকে থাকতে না পারে।

■ অনেকে আবার অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য বাড়তি বাড়তি কাজ করছেন সেটিও ঠিক নয়। বরং ক্ষতিকর।

■ ব্লিচিং পাউডারের সাথে ডেটল বা স্যাভলন মিশিয়ে লিকুইড বানাচ্ছেন। এটা উচিত নয়।

করোনাকালীন সময়ে ব্লিচিং পাউডার (ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইট) সবচেয়ে পরিচিত এবং সহজলভ্য জীবাণুনাশক। কিন্তু অনেকের মনে হতে পারে, ব্লিচিং পাউডারের সাথে অন্য যেকোন পরিষ্কারক (ডেটল, স্যাভলন) কিংবা জীবানুনাশক (স্যানিটাইজার) মিশিয়ে নিলে এর শক্তি বাড়তে পারে। হয়ত আরো বেশি জীবানু ধ্বংস হবে। এই ক্রান্তিলগ্নে এটি একেবারেই স্বাভাবিক একটি চিন্তা।

কিন্তু না!

এটা করবেন না।

ব্লিচিং পাউডারের সাথে যে কোন পরিষ্কারক বা জীবানুনাশক মেশালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। আর ক্লোরিন গ্যাস যা মাত্র ৩০ সেকেন্ডেই চোখ, ন্যাজাল প্যাসাজ (নাক) এবং ফুসফুসকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

কেউ যদি মাত্র ৩০ সেকেন্ডও এই গ্যাস নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করে তবে তার ফুসফুস স্বাভাবিক হতে ৭-৮ ঘন্টা সময় লাগবে। এই বিষাক্ত গ্যাস ফুসফুসে ঢোকার সাথে ফুসফুস মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অক্সিজেন নেয়া বন্ধ করে দিবে। এমনকি ভিনেগার (সিরকা) মেশানো যাবেনা ব্লিচিং পাউডারের সাথে।

স্বল্প পরিসরে কয়েকটি বিক্রিয়া দেয়া হলো

- ব্লিচিং পাউডার + সেনিটাইজার = বিষাক্ত ক্লোরোফর্ম
- ব্লিচিং পাউডার + ভিনেগার = বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস
- ব্লিচিং পাউডার + গ্লাস ক্লিনার = ক্লোরো-অ্যামিন (যার জন্য শ্বাসকষ্ট ও বুকব্যথা হতে পারে)
- হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড + ভিনেগার = পার-অক্সি-এসিটিক এসিড (ক্ষয়কারক)
- ব্লিচিং পাউডার + হারপিক = বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস।

কোন রাসায়নিক দ্রব্যাদিকেই সাধারণভাবে নেওয়া যাবেনা। না জেনে করা ছোট কোনকিছু থেকেই ঘটে যেতে পারে বড় রকমের দুর্ঘটনা।

দেশের অর্থনীতিকে সচল করার জন্য লকডাউন তুলে নেয়া হয়েছে। এখন নিজের সুরক্ষা নিজেকেই করতে হবে।

ব্যক্তিগত লকডাউন মেনে চলতে হবে শক্তভাবে।

১. কাউকে গায়ের কাছে ঘেঁসতে দেবেন না।

২. মাস্কের সাথে ফেস্ শিল্ড ব্যবহার করুন। বাইরে বেরোলে, খুব কার্যকরী।

৩. পকেটে সবসময় স্যানিটাইজার- প্রতি আধঘন্টা বা এক ঘন্টায় হাত ঘসুন।

৪. মোবাইলটি একটি পলিথিনে রাখুন- মোবাইল প্রধান বাহক হতে পারে।

৫. হেডফোন- না! কারণ এতে জীবাণু লেগে থাকতে পারে।

৬. স্পিকার মোডে কল রিসিভ- হ্যাঁ! মোবাইল কানের কাছে নিয়ে কল রিসিভ থেকে বিরত থাকুন।

৭. পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ভিড় এড়ান, এটা সব থেকে রিস্কি জায়গা।

৮. বাড়ির বাইরে খাওয়া এড়ান, শুকনো high calorie snack যেমন বাদাম, শুকনো ফল অল্প রাখুন সাথে, নিজের Water তো বটেই।

৯. কাজে খাবার বা Water শেয়ারিং বন্ধ করুন।

১০. অপ্রয়োজনীয় লোকসমাগম এড়িয়ে চলুন।

১১. বাইরে থেকে বা বাজারে পাওয়া টাকা নোট আলাদা পলিথিনে আনুন - এনে পারলে দুদিন একটা ট্রেতে রেখে দিন খোলা হাওয়াতে।

১২. কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে বেরোন- যা প্রায় ধোয়া যাবে- লেদার বা মোটা ক্যানভাসের ব্যাগের ফ্যাশন বাদ দিন।

১৩. ঘড়ি- না!

১৪. আংটি- না

১৫. জুয়েলারী- না

১৬. পাবলিক ওয়াশরুম- বুঝে শুনে!

১৭. মাস্ক রোজ চেন্জ হবে- অথবা প্রতিদিন ধুতে হবে।

১৮. গ্লাভস্ প্রয়োজন নেই, যদি বারবার হাত ধুতে পারেন- বরং গ্লাভস্ এ জীবানু লেগে থাকার রিস্ক বেশি, তবে স্বল্প সময়ে অধিক কাজ করার ক্ষেত্রে গ্লাভস পড়া উত্তম।

নিজের মধ্যে আরও কিছু অভ্যাস বদলাতে হবে

কথায় কথায় মুখে আঙুল দেয়া, কলমের মুখ কামড়ানো, আঙুল জিহ্বায় লাগিয়ে কাগজ উল্টানো, থুতু দিয়ে টাকা গোনা ইত্যাদি যুগ যুগ ধরে চলে আসা বাজে অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। সাথে মাস্ক পড়তে হবে এবং সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

কিভাবে ইমিউনিটি বাড়াবেন?

* নিয়ম মাফিক ঘুমাতে হবে, রাত জাগা খুব খারাপ শরীর ও ইমিউন সিস্টেমের জন্য। প্রতিদিন কমপক্ষে ৬-৮ ঘন্টা ঘুমাতে হবে।

* প্রতিদিন ব্যায়াম করতে হবে, প্রায় ১৫-৩০ মিনিট। মাসল এক্টিভিটি বাড়াতে হবে।

* প্রায়ই রোদে ঘুরতে হবে ছাদে। রোদ দরকার, ভিটামিন ডি লাগবেই।

খাবার

● ভাত কম খেয়ে তরকারি এবং প্রোটিন জাতীয় খাবার খেতে হবে।

● প্রচুর পানি খেতে হবে

● এন্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার খেতে হবে। শাক সবজি খেতে হবে।

● ভিটামিন সি বা টক যুক্ত ফল, কমলা, লেবু খেতে হবে। এছাড়াও সিজনাল ফল খেতে হবে। প্রতিদিন সকালে গরম লেবু পানি খান।

● মশলা দারুন কাজের। লবঙ্গ, জিরা, হলুদ, দারুচিনি এগুলো মারাত্মক ভাবে ইমিউনিটি বুস্ট করে। দুধে হলুদ মিশিয়ে খাবেন, হলুদ অনেক কাজের। চায়ে মশলা মিশিয়ে খাবেন। গ্রিন টি (এন্টিঅক্সিডেন্ট) বেস্ট।

● কালিজিরা কার্যকরী একটা জিনিস। প্রতিদিন সকাল বেলা উঠে এক চামচ মধুর সাথে কালিজিরা অনেক বেটার একটা কম্বিনেশন। এছাড়া কালিজিরা ভর্তা/ভাজি খাবারের সাথেও খেতে পারেন।

মানসিক : মনকে শান্ত রাখতে হবে, হাসি খুশি থাকতে হবে। ধর্মীয় প্রার্থনায় মন দিন, মন সুন্দর থাকবে।■

● লেখক: সিনিয়র নিউজ এডিটর
মাছরাঙা টেলিভিশন।

নিরাপদ পানি ও একজন মেহেরবানুর গল্প

সুমিতা দাশ জয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার সবুজেঘেরা কুলিকুন্ডা গ্রামে স্বামী মো. আহম্মদ আলী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে বাস করেন ৩৭ বছর বয়সী মেহেরবানু।

১৭ বছর আগে ২০ বছর বয়সে দরিদ্র মো. আহম্মদ আলী'র সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামীর সংসারে এসে প্রথমে দেখেন স্বামীর পরিবারে যা আয় হয় তা দিয়ে ১০ জনের সংসার চালানো খুবই কঠিন। ঘর-বাড়ির অবস্থাও তেমন ভালো না। বাড়িতে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার কোনো ব্যবস্থা নেই। বাড়ির একদিকে ফসলি জমির পাশে গর্ত করে একটি পায়খানা তৈরি করা, ভাল করে বেড়া ঘেরা কোনো কিছুই নেই। তাছাড়া হাঁস-মুরগী ভাঙ্গা পায়খানা থেকে জীবাণু ছড়াতো। প্রায়ই দেখা যেতো বাড়ির সদস্যদের ডায়রিয়া-আমাশয় ইত্যাদি রোগ ব্যাধি হচ্ছে। অন্যের টিউবওয়েল থেকে খাবার পানি নিয়ে আসতে হয়, গৃহস্থালির কাজে পঁচা ডোবার পানি ব্যবহার করতে হয়। সংসারের অভাব এবং বাড়ির নোংরা পরিবেশ নিয়ে পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজন হাসাহাসি করতো, নানা অপমানজনক কথা বলতো। মেহেরবানু স্বামীর সাথে সংসারের এ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু দারিদ্র্যতার কারণে তারা চাইলেও বাড়িঘরের পরিবেশ ভাল করতে পারেননি। আস্তে আস্তে সংসার বড় হয়। স্বামীর ভাইয়েরা আলাদা হয়ে যান। ততদিনে মেহেরবানু ২ ছেলে ও ১ মেয়ের মা। ছেলেরা তেমন পড়ালেখা না করলেও মেয়ে এখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে।

সংসারের অভাব মেটাতে মেহেরবানু সিদ্ধান্ত নেন স্বামীর কাজের পাশাপাশি তিনিও আয় উপার্জনমূলক ছোটখাটো কাজ করবেন, যাতে সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসে। তারপর তারা ধীরে ধীরে বাড়িঘরের পরিবেশ ভাল করবেন। স্বামীর সাথে কথা বলে তিনি কিছু হাঁস-মুরগী কিনেন। স্বামী বাইরে এবং তিনি বাড়িতে হাঁস মুরগী লালন-পালনের কাজ করতে থাকেন। পড়ালেখা করেনা বলে ২ ছেলেকেও হোটেলের কাজে লাগিয়ে দেন। এভাবে সংসারে অভাব কিছুটা কমে।

মেহেরবানু তাদের গ্রামে কেন্দ্র মিটিং-এ একদিন বুরোর কর্মীকে আলোচনা করতে শোনেন, যাদের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নলকূপ নাই তারা ইচ্ছে করলে বুরো থেকে কিস্তিতে ঋণ নিয়ে ল্যাট্রিন ও নলকূপ তৈরির সুবিধা পেতে পারেন। তিনি অন্যের বাড়ি থেকে পানি নিয়ে আসার কষ্ট দূর করতে বাড়িতে একটা নলকূপ তৈরির আগ্রহ দেখান। মেহেরবানু তার স্বামী ও ছেলেদের সাথে আলোচনা করে প্রথমে বুরো বাংলাদেশের নাসিরনগর শাখার ৪৪ নং কেন্দ্রের সদস্য (৪০২১) হন। তারপর বাড়িতে একটি নলকূপ স্থাপনের জন্য বিশ হাজার টাকার ঋণ প্রস্তাব করেন। ঋণ নিতে বুরো বাংলাদেশ অফিসে এসে মেহেরবানু নিরাপদ পানির বিভিন্ন প্রযুক্তি, তুলনামূলক খরচ, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝতে পারেন। বুরো বাংলাদেশ থেকে বিশ হাজার টাকার ঋণ গ্রহণ করে বাড়িতে ১৮০ ফুট গভীর করে পাকা নলকূপ স্থাপন করেন। সব মিলিয়ে মেহেরবানুর খরচ পড়ে ষোল হাজার টাকা, তার স্বামী নলকূপ তৈরিতে অনেক সহযোগিতা করেন। এখন তারা নিজের বাড়িতেই সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারেন।

বাড়িতে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা হওয়ার পর এতদিনে মেহেরবানুর অন্যের বাড়ি থেকে পানি আনার কষ্ট দূর হয়েছে এবং বাড়ির পরিবেশ বেশ সুন্দর হয়েছে। পাশাপাশি পরিবারের সবাই উন্নত স্বাস্থ্য-অভ্যাস মেনে চলেন। এখন আর আগের মতো অসুখ-বিসুখ হয় না। মেহেরবানুর মেয়ে স্কুলে পড়ছে। সংসারের আয় থেকে নির্ধারিত সময়েই ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে দেন। পাড়া প্রতিবেশী এখন আর তাদের নিয়ে উপহাস করেনা। মেহেরবানু বুরো বাংলাদেশের অফিসে যেসব বিষয় শুনেছিলেন, সেগুলো বাড়িতেও প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনা করেন। তার পরামর্শে তারাও ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখা, ল্যাট্রিন পরিষ্কার রাখা, খাবার ঢেকে রাখা, গৃহস্থালীর সকল কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহারসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য অভ্যাস মেনে চলেন।

মেহেরবানু বলেন, নিজের বাড়িতে নলকূপ না থাকায় এবং অন্যের বাড়ি থেকে পানি আনার কারণে প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের অনেক কটু কথা শুনেছি, অনেক অপমান সহ্য করেছি। বাড়ির পরিবেশ ভাল হওয়ায় এখন এসব অপমান থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমার মতো গরীব মানুষের জন্য এটা অনেক আনন্দের।

মেহেরবানুর ইচ্ছে, এরপরে বুরো বাংলাদেশ থেকে আরও বড় ও বেশি টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ি ঘরের পরিবেশ উন্নত করবেন, পাকা বাড়ি বানাবেন। কৃষি জমি আরও বাড়িয়ে নিজেরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হবেন ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে সুখে থাকবেন।■

● উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক (হেলথ এন্ড হাইজিন)
ঢাকা মেট্রো অঞ্চল

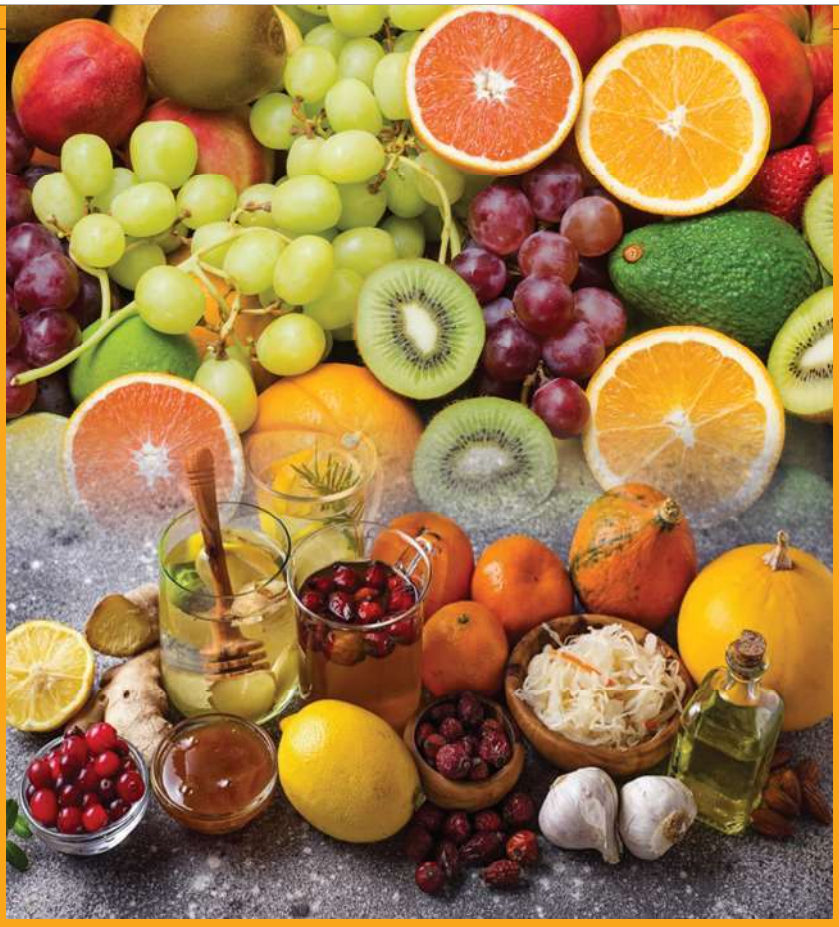

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ১০টি উপায়

বিশ্বব্যাপী করোনার প্রাদুর্ভাব ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। প্রতিদিন কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ও মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আমাদের দেশের পরিস্থিতিও এর ব্যতিক্রম নয়। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো হিমশিম খাচ্ছে এত বিপুল পরিমাণ রোগীর চিকিৎসা দিতে গিয়ে। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত প্রতিরোধের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং এজন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো বা Immunity Boost করার দিকে বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। তাই আজকে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ১০টি কার্যকর উপায় সম্পর্কে বলব।

১. খাদ্যাভ্যাস : সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। প্রচুর শাকসবজি ও ফলমূল খান। ফলের রসের পরিবর্তে গোটা ফল চিবিয়ে খেলে ভালো। এতে পুষ্টির সঙ্গে ফাইবারও পাওয়া যাবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন (৮-১০ গ্লাস)। ফাস্ট ফুড, অতিরিক্ত তেল-চর্বি ও মসলা খাবার যতটুকু সম্ভব পরিহার করুন।

২. ভিটামিনস ও মিনারেল : রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভিটামিন সি : প্রাকৃতিক উৎস হচ্ছে টক জাতীয় ফল, যেমন- লেবু, কমলা, মাল্টা, আমড়া, জাম্বুরা ইত্যাদি। এছাড়াও বাজারে ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়, যা ফ্লু উপসর্গে আপনি দিনে ১-২ বার চুষে খেতে পারেন। তবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া ভিটামিন সি-এর কার্যকারিতা বেশি।

ভিটামিন ডি : এর প্রাকৃতিক উৎস হচ্ছে সূর্যরশ্মি যা সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত শরীরের কিছু অংশ উন্মুক্ত করে (যেমন মুখমন্ডল, হাত বা ঘাড়) আপনি কাজে লাগাতে পারেন। এছাড়াও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার যেমন- ডিমের কুসুম, মাছের তেল, গরুর কলিজা, চিজ এগুলো খেতে পারেন।

জিংক : ফ্লু বা সর্দি-কাশি উপসর্গে, জিংকের বেশ উপকারিতা রয়েছে। জিংকসমৃদ্ধ খাবারগুলো হচ্ছে- আদা, রসুন, বাদাম, সামুদ্রিক মাছ, ইত্যাদি। বাজারে লজেন্স আকারে জিংক সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন ২-৩ ঘন্টা পরপর।

৩. মধু : মধুতে এমন কিছু জীবাণু ধ্বংসকারী উপাদান রয়েছেন যেমন- হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড যা RNA Virus এর বিরুদ্ধে কাজ করে। তাই ফ্লু উপসর্গে মধু বেশ উপকারী তবে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে সাবধানে খেতে হবে।

৪. প্রোবায়োটিক্স : যেমন- দই, চিজ ইত্যাদি খাবারে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৫. মানসিক চাপমুক্ত থাকুন : অতিরিক্ত মানসিক চাপে আমাদের শরীরের Sympathetic activity বেড়ে যায় এবং কর্টিসল/Cortisol হরমোন নিঃসরণ হয়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ব্যাহত করতে পারে। তাই মানসিক চাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। টিভি, সোশ্যাল মিডিয়াতে যে খবরগুলো আপনাকে মানসিক চাপে ফেলছে, সেগুলো থেকে দূরে থাকুন। মনকে Divert করার জন্য পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ভালো সময় কাটান, গান শুনুন, বই পড়ুন, মুভি দেখুন বা নতুন কিছু শিখতে মনোনিবেশ করুন। এছাড়া যোগ ব্যায়াম বা মেডিটেশন একটি খুব ভালো উপায় মনকে শান্ত রাখার।

৬. শরীরচর্চা : শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে শরীরচর্চা অপরিহার্য। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আমরা সবাই ঘরে অবস্থান করছি। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট এবং বাচ্চাদের অন্তত ১ ঘন্টা শরীরচর্চা করা উচিত। ঘরে থেকে আপনি যা করতে পারেন হাঁটাহাঁটি, সাইক্লিং, ইয়োগা, ওয়েট লিফটিং, সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা শরীর চর্চার উপায় হতে পারে।

৭. ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করা : বিশেষ করে ধূমপান, যা সরাসরি আপনার শ্বাসতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যেহেতু করোনাভাইরাস শ্বাসতন্ত্রের রোগ, এতে সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যায়। তাই ধূমপান পুরোপুরি বাদ দিন ও Respiratory Exercise করুন। মদ্যপান পুরোপুরি পরিহার করুন।

৮. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা : শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অটুট রাখতে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার বিকল্প নেই। খাবার পরিমিত খান ও শরীরিকভাবে সচল থাকুন।

৯. ঘুম : মনে রাখবেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রতিদিন অন্তত ৮ ঘন্টা করে ঘুমানোর চেষ্টা করুন। পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম আমাদের Immune System Boost করতে সাহায্য করে।

১০. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা : আমরা যদি করোনা-ভাইরাস রোগের সংক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে চাই নিজের ও আশপাশের পরিবেশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। নির্দিষ্ট সময়ে পরপর হাত সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ব্যবহার্য জিনিসপত্র জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। দরজার হাতল, সুইচ, লিফটের বাটন জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার রাখুন ও মাস্ক ব্যবহার করুন। তাই এ সময়ে এসব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। কারণ প্রতিকার নয় প্রতিরোধ উত্তম।

● **ডা. আফরিন সুলতানা**
কনসালটেন্ট, হলি ফ্যামেলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

মধুপুর

কোভিড-১৯ মহামারি
দেশব্যাপী বুরো বাংলাদেশ-এর ত্রাণ তৎপরতা

দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হলে বুরো বাংলাদেশ সে দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। দুর্যোগ কবলিত মানুষের সীমাহীন অসহায়ত্ব দূর করা সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থার কর্তব্য। কিন্তু কোভিড-১৯ এমন এক প্রাণঘাতি মহামারি দুর্যোগ যা অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এই দুর্যোগে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা বরং করোনা আক্রান্ত মানুষ যতো আপনজনই হোক না কেন কেউ তার কাছে ঘেঁষছে না। এমনও দেখা যাচ্ছে, পিতার লাশের সৎকারে সন্তান থাকে না, সন্তানের বেলায় পিতা-মাতা নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়ে আহাজারি করে। করোনা দুর্যোগে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'লকডাউন' ঘোষিত হলে অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। শুরু হয় ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষের আহাজারি। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে দৈনন্দিন পেশার শ্রমিকরা। গ্রাম এবং শহরে এমন লাখো মানুষ রয়েছেন যারা প্রতিদিন শ্রমের বিনিময়ে মজুরি পান। বিশেষ করে রিকশা শ্রমিক, রাস্তা খনন শ্রমিক, ক্ষেত মজুরসহ অন্যান্য অনেক পেশাজীবী। এই শ্রেণীর দুর্ভোগ বেড়ে যেতে থাকে। সরকারও এই শ্রমিক শ্রেণীকে খাদ্য ও অর্থ সহযোগিতা প্রদান করছে। গ্রাম এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা এই কাজটি এগিয়ে নিচ্ছেন। শহর এলাকায় ওয়ার্ড কমিশনারসহ অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছেন।

অসহায় মানুষের এই দুর্ভোগের প্রতি বুরো বাংলাদেশও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বুরো বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন দেশব্যাপী কর্মহীন অসহায় মানুষদের সহায়তায় খাদ্য সামগ্রী ও করোনা প্রতিরোধে মাস্ক ও পিপিই প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী বুরো বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে ঢাকা মহানগরীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। দেশব্যাপী ৬০ হাজার দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৬ কোটি ১৬ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। নিজস্ব তহবিল থেকে ৫ কোটি টাকা এবং কর্মীদের স্বেচ্ছা অনুদান হিসেবে একদিনের বেতনের সমপরিমাণ ১ কোটি ১৬ লাখ টাকা দিয়ে গঠিত হয় এই তহবিল। খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি পরিবারের জন্য ছিলো: চাল- ১০ কেজি, ডাল- ২ কেজি, তেল- ১ লিটার, লবণ- ১ কেজি, আলু- ৫ কেজি, সাবান- ২টি, ব্লিচিং পাউডার- ২৫০ গ্রাম ও মাস্ক- ২টি।

করোনাভাইরাস জনিত মহামারি কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সরকার প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরপরই বুরো বাংলাদেশ সারাদেশে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২২ লক্ষ লিফলেট বিতরণ করে। গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্কট ও সাধারণ মানুষের উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বুরো বাংলাদেশ গত ২৪ মার্চ থেকে কয়েক ধাপে সকল ধরনের ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া বুরো বাংলাদেশ গত ৪ জুন ঢাকার কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য ২০০টি এন-৯৫ মাস্ক প্রদান করেছে। একই সাথে টাঙ্গাইল শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও সিভিল সার্জন অফিস টাঙ্গাইলকে ১০০ সেট পিপিই প্রদান করেছে।

দেশব্যাপী পরিচালিত এই কর্মসূচিতে বুরো বাংলাদেশ স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করেছে। সারাদেশ থেকে সংগৃহীত এই কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি উপস্থাপন করা হলো।

বুরো বাংলাদেশ ঢাকার কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্সদের জন্য ২০০টি N95 মাস্ক প্রদান করেছে। গত ৪ জুন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল আহমেদের কাছে মাস্কগুলো হস্তান্তর করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত।

ঢাকা মেট্রো

টাঙ্গাইল

কুমিল্লা

রংপুর সিটি কর্পোরেশন

পাবনা

সিরাজগঞ্জ

রাজশাহী

চুয়াডাঙ্গা

নাটোর

ময়মনসিংহ

মধুপুর

নীলফামারী

যশোর বাহাদুরপুর

মেহেরপুর

কক্সবাজার

চট্টগ্রাম

বরিশাল

করোনা পরিস্থিতিতে জরুরিভাবে মাদারীপুর সদর উপজেলায় ৩০০টি পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুরের সম্মানিত জেলা প্রশাসক মো. ওয়াহিদুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন গিয়াস, বুরো বাংলাদেশ-এর বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মীর মুকুল হোসেন এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবুল বাশার মিয়া।

গত ১২ মে ফেনী সদর উপজেলায় নির্বাহী কর্মকর্তা নাসরীন সুলতানার উপস্থিতিতে বুরো বাংলাদেশ নোয়াখালী অঞ্চলের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়ে। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশ নোয়াখালী অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবিএম আলাউদ্দিন আহ্মেদ ও এলাকা ব্যবস্থাপক মো. নজরুল ইসলাম।

শোক সংবাদ

মো. কামাল উদ্দিন

বুরো বাংলাদেশ কক্সবাজার অঞ্চলের লোহাগড়া এলাকার সাতকানিয়া শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মসূচি সংগঠক মো. কামাল উদ্দিন করোনা আক্রান্ত হয়ে ১৬ জুন '২০ কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজেউন)। তিনি স্ত্রীসহ এক কন্যা ও এক পুত্র রেখে গেছেন। তার বাড়ি কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলাধীন পোনরা গ্রামে। বুরো পরিবার তার মতো একজন দক্ষ কর্মীকে হারিয়ে মর্মাহত এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

সেলিম হোসেন

চাঁদপুর অঞ্চলের শাহরাস্তি শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মসূচি সংগঠক সেলিম হোসেন গত ৩০ জুন '২০ দুপুর দেড়টায় কেন্দ্র কালেকশন শেষে অফিসে ফেরার পথে শাহরাস্তি উপজেলার গিলাবাজার নামক স্থানে হাইড্রোলিক হাইচার গাড়ির সাথে তার মোটারসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনায় মরাত্মক আহত হন।

স্থানীয় লোকজন তাকে শাহরাস্তি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন (ইন্নালিল্লাহি..রাজেউন)। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর উপজেলাধীন ফলদা ঘোনাপাড়া।

কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল, প্রাণবন্ত এবং হাসিখুশী মানুষ। তার মতো সৎ, আন্তরিক ও দক্ষ কর্মীকে হারিয়ে বুরো পরিবার মর্মাহত এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

অরুণ চন্দ্র দাস

মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র কুমিল্লার নিরাপত্তা প্রহরী সুপারভাইজার অরুণ চন্দ্র দাস (পিন ১৭০৭৫) হঠাৎ অসুস্থ হলে তৎক্ষণিক কুমিল্লা সিএমএইচ-এ নেয়ার পথে ৩০ জুন '২০ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন মাইগ্রেন ও টিবি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ কন্যা ও ২ পুত্র রেখে গেছেন। তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা উপজেলার খৈচারা গ্রামে।

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সৎ, আন্তরিক, দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মী। বুরো পরিবার তার এই মৃত্যুতে শোকার্ত এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ইব্রাহিম মিয়া

বুরো বাংলাদেশ-এর চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাঁদগাঁও শাখার ব্যবস্থাপক ইব্রাহিম মিয়া গত ২৯ জুলাই '২০ তারিখে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের নিজ বাড়িতে সিলিং ফ্যান-এর কানেকশন ঠিক করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান (ইন্নালিল্লাহি...রাজেউন)।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অজ্ঞান হওয়ার পর দেলদুয়ার থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি স্ত্রী সাইদা খন্দকার ও দু'সন্তান রিধি হক এবং ছেলে সাইদকে (দ্বিতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত) রেখে গেছেন।

মো. কামাল উদ্দিন

সেলিম হোসেন

অরুণ চন্দ্র দাস

ইব্রাহিম মিয়া

- নিলুফুন নাহার চৌধুরী, কর্মকর্তা, এইচআরএম
- রোকেয়া খাতুন, সহ. কর্মকর্তা, এইচআরএম

এফএনবি'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন জাকির হোসেন

দেশের এনজিও এবং এমএফআই সেক্টরের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (FNB)-এর চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন বুরো বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন। এফএনবি'র প্রতিষ্ঠাতাদের একজন জাকির হোসেন আগামী তিন বছরের জন্য এই পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

এনজিও সেক্টরের উদ্যমী, সৎ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও দূরদর্শী উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব জাকির হোসেন-এর জন্ম টাঙ্গাইল শহরের আমঘাট রোডস্থ এক ব্যবসায়ী পরিবারে ১৯৫৫ সালের ২ জুলাই। তার পিতা মরহুম চাঁন মিয়া ও মাতা মরহুম রাবেয়া খাতুন।

জনাব জাকির হোসেন মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা দূর করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বুরো টাঙ্গাইল– যা এখন দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রতিষ্ঠান 'বুরো বাংলাদেশ'। দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বুরো বাংলাদেশ শীর্ষ পর্যায়ের একটি যার গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২০ লাখ।

জনাব জাকির হোসেন অসংখ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত। তিনি ইনাফি বোর্ডের ভাইস চেয়ার, বাংলাদেশ ইনাফি ফাউন্ডেশনের সদস্য, এসিসিএল-এর সদস্য, টাঙ্গাইল ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এর ভাইস চেয়ার, লায়ন্স ক্লাব, শিল্পকলা একাডেমি, সাধারণ গ্রন্থাগার টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, রাইফেলস ক্লাব-এর সদস্য, টাঙ্গাইল জেলা সমিতি ঢাকার পেট্রন ও জীবন সদস্য, টাঙ্গাইল সরকারি মডেল প্রাইমারি স্কুলের সভাপতি ও হাই কেয়ার স্কুল টাঙ্গাইল এর বোর্ড মেম্বার।

তাঁর স্ত্রী রাহেলা জাকির একজন নারী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী। এই দম্পতি ২ কন্যা সন্তানের গর্বিত জনক-জননী।

এফএনবি'র নবনির্বাচিত পরিষদ

গত ১৪ মার্চ, ২০২০ বুরো বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অনুষ্ঠিত ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) এর বার্ষিক সভায় আগামী তিন বছরের (২০২০-২০২২) জন্য বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন চেয়ারপার্সন, ব্র্যাক এর পরিচালক জনাব কে এ এম মোর্শেদ ভাইস চেয়ারপার্সন এবং আশার এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছেন।

কার্যনির্বাহী বোর্ডের সদস্য হিসেবে এইচ এম নোমান (ডরপ), সুশান্ত কুমার প্রামাণিক (টিএমএসএস), মুর্শেদ আলম সরকার (পপি), ড. এম. এহছানুর রহমান (ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন), আফতাবুর রহমান জাফরী (ঘাসফুল), রাবেয়া বেগম (এসডিএস), শহীদুল হক (এসএআরপিভি), এমএম আনোয়ার উল্লাহ (ব্রেভ), রাসেল আহম্মেদ লিটন (এসকেএস ফাউন্ডেশন), ফকির মো. মাজহারুল ইসলাম (ওআরএ), বেলাল আহমদ (এসএসকেএস), মো. তৌফিকুল ইসলাম (আশ্রয়), মো. লুৎফর রহমান লাবু (রাস), জনব ভগবতী ঘোষ (ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি), মো. সাইফুল ইসলাম (সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা) এবং চৌধুরী মো. মাসুম (সংগ্রাম) নির্বাচিত হয়েছেন।

এফএনবি'র বিদায়ী চেয়ার এস এন কৈরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিগত বছরের কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণী এবং চলতি বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও বাজেট আলোচিত হয়।

ছবিতে এফএনবি'র নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এম.এ. ইউসুফ খান, অর্থ সচিব, নির্বাহী পরিষদ, বুরো বাংলাদেশ; নির্বাচন কমিশনার রেবেকা সানইয়াত, নির্বাহী পরিচালক, কাপ এবং নির্বাচন কমিশনার ইউনুস আলী মিয়া, সহকারী পরিচালক, সিডিএফ এর সাথে এফএনবি'র নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ।

বুরো বাংলাদেশের বিশেষ কর্মসূচি'র আওতায় নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক তিনটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে গাইবান্ধা, রংপুর ও কুড়িগ্রামে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন যথাক্রমে গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক মো. আবদুল মতিন, রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার কে এম তারিকুল ইসলাম এবং কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মোছাম্মৎ সুলতানা পারভীন। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানগুলোতে আরো উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক এরশাদ আলম, বগুড়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোতাহারুল ইসলাম এবং রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আহসান হাবিব।

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এফডিএ কর্তৃক গ্রামীণ পাকা রাস্তায় জীবানুনাশক ঔষধ ছিটানো হচ্ছে এবং সাবান বিতরণ করা হচ্ছে।

নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ফরিদপুর জোনে অসহায় ও দুঃস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে এসডিসি

এএসডি'র উদ্যোগে করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মহীন, দুস্থ-অসহায় মানুষের মাঝে গত ৮ জুলাই রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বেগম নূরজাহান মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এএসডি-এর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডিজাষ্টার রেসপন্স কোঅর্ডিনেটর এম এ করিম, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রকল্প কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদ, বেগম নূরজাহান মোমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আলাউদ্দিনসহ প্রমুখ।

করোনা দুর্যোগে এফএনবি সদস্যদের ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা

মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ পুনর্গঠনের কাজ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে এনজিওসমুহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যে কোন দুর্যোগে সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এনজিওসমুহ কাজ করে থাকে। এবারের বিশ্বব্যাপী অদৃশ্য শত্রু "করোনাভাইরাস"-এর সাথে যুদ্ধেও এনজিওগুলো অতীতের যে কোন মানবিক বিপর্যয়ের মতো একইভাবে এগিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই এনজিও সেক্টরের প্রধান নেটওয়ার্ক ফেডারেশন অব এনজিওস্ ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)-এর সদস্য-সংস্থাসমূহ কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও মানুষের দুর্ভোগ নিরসনে তথা আর্তমানবতার সেবায় অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। এই করোনা মহামারীর সময়ে এগিয়ে এসেছে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী। এই সময়ে এনজিওসমূহ যেমন তাদের কর্মীদের খেয়াল রাখছে ঠিক তেমনি বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্যেও অবদান রেখে যাচ্ছে।

এফএনবি সদস্য সংস্থাসমূহ শুরু থেকেই সামাজিক সচেতনতামূলক লিফলেট-স্টিকার বিতরণ, মাইকিং, ব্যানার-ফেস্টুন টানানোর মতো কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। সেই সাথে 'হাত ধোয়া প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব ক্যাম্পেইন'-এর মত কাজের পাশাপাশি স্যানিটাইজার, হ্যান্ড ওয়াশ, ব্লিচিং পাউডার, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস, প্রটেকটিভ ওয়্যার জাতীয় স্বাস্থ্যসামগ্রী তৈরি ও বিতরণ করেছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বন্ধ থাকায় কর্মীদের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ের এফএনবি সদস্য এনজিওসমূহ নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী কাজ করে চলেছে যার কিছুটা প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হলো:

বাংলাদেশে সংক্রমণের শুরু থেকেই ব্র্যাক ব্যাপক কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছে। ব্র্যাকের সম্মুখসারির কর্মীরা সারা দেশের ৬৮ মিলিয়ন মানুষকে সচেতনতামূলক ওরিয়েন্টেশন দিয়েছে। ১৭,৬১,১৯৯টি স্বাস্থ্য সামগ্রী কর্মী এবং কমিউনিটির জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ব্র্যাক ৮,৭৬,০০০ সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছে যার মধ্যে রয়েছে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সার্জিক্যাল ক্যাপ, সেফটি গ্লাস। ব্র্যাক টেলিকাউন্সিলিং প্লাটফর্ম 'মনের যত্ন মোবাইলে' -এর মাধ্যমে ১২৪৩ জনকে কাউন্সিলিং করা হয়েছে। ব্র্যাক শহর এবং গ্রামীণ নিম্ন আয়ের ১৪,৮৪০টি পরিবারে ২,১৭,০৫,০০০ টাকার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ এবং সারা দেশে নিম্ন আয়ের ৩ লক্ষ ৫০ হাজার পরিবারের মধ্যে ৫২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে।

এছাড়া ব্র্যাক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সহায়তার অংশ হিসেবে ৫০টি করোনা পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহের বুথ স্থাপন করেছে। ব্র্যাকের যাবতীয় উদ্যোগ ও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

করোনা মহামারির কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষ। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসাধারণের চলাচল ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে পড়লে উল্লেখিত শ্রেণির মানুষ দ্রুত জীবিকা হারিয়ে চরম আর্থিক কষ্টে নিপতিত হয়। বিশেষতঃ দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছে। এমতাবস্থায় আশা (ASA) দরিদ্র, অতি-দরিদ্র ও নিম্ন-আয়ের মানুষদের জন্য খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করে। রাজধানী ঢাকা এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী দুঃস্থ মানুষদের নিকট আশা দ্রুততার সঙ্গে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেয়।

করোনা মহামারিতে খাদ্য সংকটে থাকা ১,৫৪,৬৭০টি পরিবারকে আশা ১১.৫২ কোটি টাকা মূল্যমানের ২,৪৭৫ মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে। প্রতিটি পরিবারকে ১টি করে ব্যাগে দশ কেজি চাল, দুই কেজি ডাল, দুই কেজি আলু, এক লিটার তেল ও এক কেজি লবণ বিতরণ করা হয়। এ সকল খাদ্যসামগ্রী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও করোনা সংক্রমণ ঝুঁকি নিরসনে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে আশার পক্ষ থেকে সারা দেশে ২০ লাখ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বুরো বাংলাদেশ সকল জেলা ও উপজেলায় করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতামূলক ২২ লক্ষ ২৫ হাজার রঙিন লিফলেট বিতরণ এবং ৫১,৬১৭টি পরিবারের মধ্যে ৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। ত্রাণ প্যাকেজে ছিল: ১০ কেজি সেদ্ধ চাউল, ১ কেজি মুশুর ডাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি লবণ, ১ লিটার খাবার তেল, ২০০ গ্রামের ১ প্যাকেট গুড়ো দুধ, ১ প্যাকেট সেমাই, ২টি সাবান এবং ২টি মাস্ক। বুরো বাংলাদেশ ঢাকার কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য ২০০ এন ৯৫ মাস্ক এবং টাঙ্গাইল শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও টাঙ্গাইল সিভিল সার্জন অফিসের জন্য ১০০ সেট পিপিই প্রদান করেছে।

সাজেদা ফাউন্ডেশন ২১টি জেলার ১২৫০ পরিবারের মধ্যে ১,৬২,৫০০ টাকার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (সাবান, স্যানিটাইজার, মাস্ক) বিতরণ করেছে এবং চিকিৎসকদের জন্য ২,৮৭,৬০,২০০ টাকা ব্যয়ে ২০,৫৪৩ সেট ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) প্রদান করেছে। এছাড়া ২৪,২০,০০০ টাকা ব্যয়ে ৪৮৪ টি ভ্রাম্যমান হাত ধোঁয়ার কেন্দ্র স্থাপন এবং তৈরি পোশাক কারখানায় ৫১,২৪০ টাকা ব্যয়ে ২৮৯ টি ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন স্থাপন করেছে।

৪,৬৮,২০,২৩০ টাকা ব্যয়ে ৬৫,৭৬৮টি পরিবারে খাদ্য ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী প্যাকেজ (চাল, ডাল, আলু, তেল, লবন, সাবান)

এবং ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে (২৭৯৮ জন) ৩,৩৫,৭৬০ টাকা ব্যয়ে তৈরি খাবার বিতরণ করেছে। এছাড়া ১৬,২৩,৮৩৫ টাকা নগদ অর্থ বিতরণের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সকল কর্মীদের একদিনের মূল বেতন প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে টিএমএসএস নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিশ্বব্যাপী মহামারি ব্যাধি করোনা ভাইরাস সংক্রমণ দুর্যোগ মুহূর্তে টিএমএসএস তার সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী দরিদ্র মানুষের কষ্ট দূরীকরণের জন্য খাদ্য ও চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছে। ১০ টন ব্লিচিং পাউডার ক্রয় করে বিভিন্ন রাস্তায় এবং সিভিল সার্জন বগুড়ার পরামর্শে ২টি পানি ছিটানোর ট্যাংক লরী দ্বারা কমিউনিটিতে ডিজইনফেকশনের কাজ করেছে। জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতামূলক ৮ লক্ষ লিফলেট বিতরণ এবং টিএমএসএস হ্যান্ডিক্রাফট কর্তৃক ১০ লক্ষ মাস্ক তৈরী করে বিতরণ ও টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ এবং রফাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতাল কর্তৃক ৫ হাজার হ্যান্ডস্যানিটাইজার তৈরী করে বিতরণ করা হয়েছে। অধিকন্ত, ৯ লক্ষ ৫০ হাজার সাবান এবং ২ হাজার ৫ শত পিপিই বিতরণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ভোগ্য পণ্য বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। এপর্যন্ত টিএমএসএস ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সকল কর্মীদের একদিনের বেতন প্রদান করা হয়েছে।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) ৩,৪০০ পরিবারের মধ্যে ২৩,৬৯,৮০০ টাকার ত্রানসামগ্রী বিতরণ করেছে। প্যাকেজে ছিল: চাল, ডাল, আটা, লবন, আলু, পিয়াজ, তেল, বিস্কুট ও সাবান। এছাড়া টাঙ্গাইল পতিতালয়ে জনপ্রতি ৩০০ টাকা হিসেবে ৫১০ জনকে নগদ অর্থ প্রদান করেছে।

আশ্রয় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসী ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে। তানোর ও মুন্ডুমালা এলাকায় ৬২৭ টি আদিবাসী ও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর উপজেলার ১০৫টি পরিবার, নিয়ামতপুর উপজেলার ১০৫টি পরিবার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ৭৫টি পরিবার, আমনুরা শাখার মাধ্যমে ৭৫টি পরিবার এবং নাচোল উপজেলার ১৫০টি আদিবাসী ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সাজেদা ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় নাচোল এলাকার ৪০০ জন কর্মহীন ও দরিদ্র অসহায় আদিবাসী নারী-পুরুষের মাঝে ৭৫০ টাকা করে মোট ৩ (তিন) লক্ষ টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। দাতা সংস্থা নেটজ-বাংলাদেশ এর আর্থিক সহযোগিতায় নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর, বদলগাছি, পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলায় রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের অধীনে ৩,৬২৪টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়া করোনাভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক প্রচারপত্র এবং ৯,৭০০টি মাস্ক বিতরণ করা হয়।

ঘাসফুলের পক্ষ হতে কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ন্ত্রণে দুর্যোগকালীন কর্মহীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সহায়তায় মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এর মাধ্যমে সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের মুল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ১,৭১,১৫২ (এক লক্ষ একাত্তর হাজার একশত বায়ান্ন টাকা) প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

মিরসরাইয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দ্য পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট), ঘাসফুল ও আইডিএফের যৌথ উদ্যোগে পল্লী চিকিৎসক ও ইউপি হেলথ প্রোভাইডারদেরকে পিপিই প্রদান, কৃষকদের সার ও বীজ সহায়তা এবং প্রতিবন্ধী ও অটিজম ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগে পল্লী চিকিৎসক, ইউপি হেলথ প্রোভাইডার, প্রশাসন ও সাংবাদিকদের মাঝে ১ হাজার ২'শ পিস পিপিই, ৫'শ জন প্রতিবন্ধী মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ এবং ৫'শ জন দরিদ্র কৃষকের মাঝে সবজী, ধান বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। এ কার্যক্রমে ঘাসফুল ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) সহায়তা প্রদান করে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই এনজিও সেক্টরের প্রধান নেটওয়ার্ক ফেডারেশন অব এনজিওস্ ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)-এর সদস্য-সংস্থাসমূহ কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও মানুষের দুর্ভোগ নিরসনে তথা আর্তমানবতার সেবায় অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। এই করোনা মহামারির সময়ে এগিয়ে এসেছে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী। এই সময়ে এনজিওসমূহ যেমন তাদের কর্মীদের খেয়াল রাখছে ঠিক তেমনি বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্যেও অবদান রেখে যাচ্ছে।

রাজবাড়ী উন্নয়ন সংস্থা (রাস) সাজেদা ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া যৌনপল্লীতে আসহায় মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে। সেখানে ৩০০ জন যৌনকর্মীকে ৭০০ টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাসের নির্বাহী পরিচালক ও রাজবাড়ী জেলা এনজিও ফেডারেশনের সভাপতি জনাব মোঃ লুৎফর রহমান লাবু। উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর রাজবাড়ী জনাব গৌতম চন্দ্র দে, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার গোয়ালন্দ জনাব চন্দন কুমার মিত্র, ডিপার নির্বাহী পরিচালক ফজলুল হক, সুইফ এর নির্বাহী পরিচালক বিপ্লব দত্ত, এম এম এস এর নির্বাহী পরিচালক মর্জিনা বেগম, গণস্বাস্থ্যের মো. জুলফিকর আলী ও ডা. তোফায়েল আলীসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ।

আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের এনজিওসমূহ তাদের সামর্থ্যের সবটুকু নিয়ে আর্ত মানবতার সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে; সচেতনতার পাশাপাশি ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে নিজস্ব অর্থায়নে। শরীয়তপুরের শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস), সোডেপ, সিএসএস; ফরিদপুরের এফডিএ , বিএফএফ, এসডিসি, পিডাব্লুও, ডিএমবি, একেকে, ডিএনপি; মানিকগঞ্জের পাশা, গণ কল্যাণ ট্রাস্ট; চট্টগ্রামের কোডেক, অপকা; কুমিল্লার আবেদা মান্নান ফাউন্ডেশন; কক্সবাজারের অর্ণব; নোয়াখালীর সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র; সিলেটের এসএসকেএস, আরডব্লিউডিও, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন; রাজশাহীর আশ্রয়, লফস; বগুড়ার নামুজা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থা ; সিরাজগঞ্জের সুক; নাটোরের এসকেএসএস, নিডা সোসাইটি, দ্বীপশিখা, এনএসকেএস; চাঁপাই নবাবগঞ্জের আরএসডিএফ, যমুনা মানব কল্যাণ সংস্থা ও সেবা ফাউন্ডেশন; গাইবান্ধার এসকেএস ফাউন্ডেশন, ছিন্নমূল মহিলা সমিতি; কুড়িগ্রামের এএফএডি, সিএসডিকে; দিনাজপুরের সিডিএ, এএসএসবি; ঠাকুরগাঁও-এর এসো জীবন গড়ি ও উপমা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা; নীলফামারীর ইউএসএস; খুলনার সুশীলন, আলমেরাজ ফাউন্ডেশন; যশোরের জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন; কুষ্টিয়ার সেতু; বরিশালের আরোহী, দিশা; বরগুনার সংগ্রাম; ঝালকাঠীর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা; টাঙ্গাইলের সেবা; ময়মনসিংহের সেবা ফাউন্ডেশন; শেরপুরের সেতু; জামালপুরের উন্নয়ন সংঘ; নেত্রকোনার স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি, সেরা, শ্রমজীবী উন্নয়ন সংস্থাসহ অন্যান্যরা অনুরূপ সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও ত্রাণ তৎপরতা গ্রহণ করেছে।

যতদিন প্রয়োজন হবে, সরকারের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এফএনবি সদস্য-সংস্থাসমূহ ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে, নিরলসভাবে কাজ করে যাবে আর্তমানবতার সেবায়।■

● মো. রফিকুল ইসলাম
পরিচালক, এফএনবি

করোনা মহামারিতে আশা'র খাদ্য সহায়তা প্রদান

করোনায় মহামারিতে জীবিকা হারানো দেড় লাখ পরিবারকে আশা ১২ কোটি টাকা মূল্যমানের খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ, র‍্যাব, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এসব খাদ্য সহায়তা দরিদ্র ও দুর্গত পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, করোনা সংক্রমণ ঝুঁকি নিরসনে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে আশার পক্ষ থেকে সারা দেশে ২০ লাখ লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। আশা সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পদ থেকে এসব সহায়তা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বরাবরই আশা যে কোন দুর্যোগ ও মহামারিতে দেশের সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করে। এবারের করোনা মহামারিতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আশার সেবাগ্রহণকারী প্রায় ৭০ লাখ পরিবারের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। করোনা মহামারির ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আশা সদস্যদের জন্য নমনীয় ঋণ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

করোনায় বিডো'র ত্রাণ তৎপরতা

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সারাদেশে অঘোষিত লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। কাজ না থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষ। শহরের বা গ্রামের অসহায় কর্মহীন ওইসব পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। আবার কেউ দাঁড়াচ্ছেন ব্যক্তি উদ্যোগেও।

এমন এক বেসরকারী সংস্থা বিডো। দেশের এমন দুর্যোগ মুহূর্তে যার হাত গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত ছাড়িয়েছে। গ্রামের অসহায় দরিদ্রদের মধ্যে চাল, ডাল, আলু, মুড়ি ও সাবান বিতরণ করে সংস্থাটি। কোথাও আবার প্রশাসনের ত্রাণ তহবিলে নগদ টাকা ও চাল হস্তান্তর করেছে ।

বরেন্দ্র ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বিডো) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাটি নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম সম্প্রতি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ত্রাণ তহবিলে সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের হাতে ৫০০ কেজি চাল তুলে দেন।

এর আগে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাবিহা সুলতানার হাতে প্রশাসনের তহবিলে ৫০০ কেজি চাল তুলে দেন। একইভাবে তানোর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুশান্ত কুমার মাহাতো ও সমাজ সেবা অফিসার মতিউর রহমানের হাতে অসহায় দরিদ্র পরিবারদের বিতরণ করার জন্য নগদ ২৫ হাজার টাকা তুলে দেন বিডোর নির্বাহী পরিচালক। সংস্থাটি উপজেলার অসহায় হতদরিদ্র প্রায় ৩০০ পরিবারের মধ্যে চাল, ডাল, আলু, মুড়ি ও সাবানসহ নানা খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

সাজেদা হাসপাতাল
করোনা মোকাবেলায় সাহসী অবস্থানে

দেশে করোনার আক্রমণের শুরুতে অনেক হাসপাতালই যখন চাইছিল না নিজেদের ঝুঁকি নিয়ে করোনা আক্রান্তদের সেবা দিতে তখন সামনের সারিতে থেকে সাজেদা ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভুক্ত নারায়ণগঞ্জের সাজেদা হাসপাতাল সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

এই হাসপাতালে কোয়ারেন্টিন সুবিধার পাশাপাশি, কোভিড-১৯ রোগীর সেবা, ডায়ালিসিস, ভেন্টিলেশন এবং আইসিইউ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত ২৩ মার্চ এই সামগ্রিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে এ বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করে সাজেদা ফাউন্ডেশন এবং রেনাটা।

এ হাসপাতালটি নিউমোনিয়ার লক্ষ্মণযুক্ত রোগীদের ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) ভর্তি নেয়। হাসপাতালে কর্মরত ৩০ জন ডাক্তার, ৫০ জন নার্স এবং ৭০ জন সেবাকর্মী দিন-রাত সেবা দিয়েছে তাদের জীবনের ঝুঁকির কথা জেনেই। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, হয়তো জীবন নিয়েও শঙ্কা কাজ করে, তবু মানুষের পাশে মানুষই দাঁড়াবে– এই সত্য শ্লোগান তারা উচ্চকিত করে রেখেছেন।

এ বিষয়ে হাসপাতালে কর্মরত একজন ডাক্তার বলেন, রোগীর সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়। কারণ দেখা যায়, একজন রোগীকে আমি ইনকিউবেশন করছি বা ভেন্টিলেশন দিচ্ছি তারা সবাই মিলেই থাকছি। সবচেয়ে কাছে গিয়েই এই কাজটা করতে হচ্ছে। এখানে ১ মিটার দূরত্ব রাখারও কোন পথ নেই। রোগীর মুখ আর আমার মুখের দূরত্ব এই এতটুকু সেক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে আমরা কাজ করছি। পাশাপাশি মানসিক চাপ তো আছেই।

হাসপাতালের অন্য এক ডাক্তার বলেন, ঝুঁকি তো আছেই, বাকিটা আল্লাহর উপর ভরসা করেই কাজ করছি। প্রায় ২ মাসের বেশি সময় ধরে এখানে আছি, পরিবার থেকে আলাদা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হাসপাতালটিতে প্রতিদিন গড়ে ১৫০ জন রোগী আসছেন। চালু রয়েছে গর্ভবতী সেবা, শিশু বিভাগ, মেডিসিন বিভাগ, চক্ষু বিভাগ, অর্থোপেডিক্স, সার্জারি, প্যাথলজি, এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রাফিসহ সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা। এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা আছে ২৪ ঘন্টাই।

প্রবেশপথে নিরাপত্তাকর্মীরা দিচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাইকিং করে সবাইকে মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার তাগিদও দেয়া হচ্ছে। জ্বর, ঠাণ্ডা, কাশি নিয়ে কোন রোগী আসলে তাকে আলাদাভাবে, আলাদাপথে মনিটরিং করা হয়।

হাসপাতালের সামনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান-পানির হাত ধোয়ার ব্যবস্থার পাশাপাশি, রাখা হয়েছে জীবাণুনাশক টানেলও, যা প্রতিদিন জীবাণুনাশক সল্যুশনের মাধ্যমে প্রায় ২০০০ জনকে জীবাণুমুক্ত করার ক্ষমতা রাখে।

নারায়ণগঞ্জের ৫০ শয্যাবিশিষ্ট সাজেদা হাসপাতাল ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেসের (ডিজিএইচএস) সাথে যৌথ উদ্যোগে করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দেবার যুদ্ধে নেমেছে। তারা আশা করছেন পরিস্থিতির সাথে সাথে তাদের প্রচেষ্টাও করোনা মহামারীকে রুখে দিতে আরও ধারালো হয়ে উঠবে।

ঘাসফুল-এর উদ্যোগে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঘাসফুল-এর উদ্যোগে গত ৪ মে পঞ্চাশজন ইউপি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও দুস্থ অসহায় ও কর্মহীন এক'শ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় ।

বিতরণকৃত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম ও খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল ১০ কেজি চাল, মসুর ডাল ১ কেজি, আলু ৩ কেজি, লবণ আধা কেজি, সাবান ২টি, তেল ১ লিটার, চিনি ১ কেজি, পেঁয়াজ ১ কেজি, মাস্ক ২টি। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর ইউএনও জয়া মারিয়া পেরেরা। ত্রাণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ফরিদ আহম্মেদ।

আশ্রয়-এর উদ্যোগে আদিবাসীদের মাঝে খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম

গত ১৪ এপ্রিল আশ্রয় এর উদ্যোগে তানোর ও মুন্ডুমালা এলাকায় ১০০টি আদিবাসী ও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো. তৌফিকুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব আবদুর রাজ্জাক এবং মহাঅঞ্চল ব্যবস্থাপক জনাব সেলিম আহম্মেদ। এছাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তানোর এর নিকট ১০০টি মাস্ক বিতরণ করা হয়।

দাতা সংস্থা হেইফার ইন্টারন্যাশনাল-এর আর্থিক সহায়তায় মুন্ডুমালা মহিলা সমবায় সমিতির উদ্যোগে মুন্ডুমালা ও তানোর এলাকায় ৫২৭টি দরিদ্র ও আদিবাসী পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব হোপনা কিসকু এবং অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।

দাতা সংস্থা নেটজ-বাংলাদেশ এর আর্থিক সহযোগিতায় নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর, বদলগাছি, পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলায় রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের অধীনে ৩,৬২৪টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিতরণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউপি চেয়ারম্যান, পুলিশ প্রশাসন, আশ্রয় এর প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইউনিট ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সংস্থা কর্তৃক করোনাভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক প্রচারপত্র সংস্থার বিভিন্ন কর্ম এলাকায় বিতরণ করা হয়।

পথশিশুদের সুরক্ষার দাবি এএসডির

করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে দেশব্যাপী যখন সব মানুষ ঘরে, তখন পথশিশুরা দল বেঁধে ঘুরছে, টারমিনালসহ বিভিন্ন স্থানে জটলা করছে, পাশাপাশি ঘুমাচ্ছে। এ ছাড়া লগডাউন পরিস্থিতিতে তারা চরমভাবে খাদ্য সংকটে রয়েছে। পথশিশুরা যেমনি করোনাভাইরাস সক্রামনের ঝুঁকিতে রয়েছে, তেমনি তাদের মাধ্যমে করোনা ছড়ানোর সম্ভাবনাও রয়েছে বহুলাংশে। এ অবস্থায় করোনাভাইরাস থেকে এ সকল সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের সুরক্ষার দাবী জানিয়েছে পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে যাওয়া বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)।

এএসডির নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ. চৌধুরী বলেন, করোনাভাইরাস মহামারিতে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে পথশিশুরা। ক্রমশ পথশিশুদের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বাড়ছে। এই মহামারি পরিস্থিতিতে পথশিশুদের সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। না হয় তারা করোনায় আক্রান্ত হতে পারে। করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে পথশিশুদেও কোনো ধারণা নেই। এজন্য জরুরি ভিত্তিতে তাদের ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, ডভেলপমেন্ট অব চিলড্রেন এ্যাট হাই রিস্ক (ডিসিএইচআর) প্রকল্পের মাধ্যমে এএসডি দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে তিনটি আনন্দ নিবাস (থাকা, খাওয়াসহ), তিনটি শিক্ষা ও বিনোদন কেন্দ্র এবং বস্তি এলাকার শিশুদের জন্য ৬টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

পাবনা জেলা পিসিডি'র ত্রাণ কার্যক্রম

করোনা ভাইরাস রোগের বিস্তার রোধে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে অসহায়, দরিদ্র ও কর্মহীন মানুষকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পাবনার জেলা প্রশাসক কবীর মাহমুদ-এর নিকট 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলে' এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন পিসিডির নির্বাহী পরিচালক মো. শফিকুল আলম।

পিসিডি ইতোমধ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৮০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে। এছাড়া সংস্থা স্থানীয় প্রশাসন ও জন প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে তার নিজস্ব কর্মএলাকার দরিদ্র/কর্মহীন/ নিম্ন আয়ের ২৭০০ পরিবারের মাঝে ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ত্রাণ সামগ্রী (চাউল, ডাউল, আলু ও লবণ), ৩০০ ভ্যান চালককে ৬০ হাজার টাকা নগদ অর্থ প্রদান, ৫ হাজার পিস মাস্ক ও ৫০০ পিস সাবান বিতরণসহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেছে ১০ হাজারটি।

উল্লেখ্য, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে পিসিডি ১১০০ দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে চাল, সেমাই ও চিনি বিতরণ এবং দুধ ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করেছে। করোনা ভাইরাস আরও দীর্ঘায়িত হলে পিসিডির এই ক্ষুদ্র ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন, পিসিডির প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মো. শফিকুল আলম।

মহামারি মোকাবেলায় ওসাকা'র কার্যক্রম

সম্প্রতি করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কাজের অংশ হিসেবে উদ্যোক্তা ও কারিগরদের মাঝে ৪ হাজার মাস্ক বিতরণ করে ওসাকা। এ সময় করোনা নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে এটি প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন থাকার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় গত ২১ এপ্রিল ওসাকা'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১ দিনের মূল বেতন অর্থাৎ এক লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত তিরাশি টাকা অনুদান হিসেবে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া ২৫-২৬ এপ্রিল দেশব্যাপী চলমান করোনা ভাইরাসের বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মহীন ও নিম্ন আয়ের ২ হাজার ৫শ দরিদ্র মানুষের মাঝে সর্বমোট ২০ লক্ষ টাকার খাদ্য সামগ্রী ও নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

উক্ত সহায়তা পাবনা জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় জেলার ১২শ পরিবারের জন্য ১২শ প্যাকেট এবং সংস্থার নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমে ৬শ পরিবারের জন্য ৬শ প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী (১০ কেজি চাল, ৩ কেজি আলু, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার তেল, ১ কেজি লবণ, ২টি লাইফবয় সাবান) বিতরণ করা হয়।

এছাড়া কর্মএলাকায় কর্মহীন নিম্নআয়ের ৭শ পরিবারের মাঝে জনপ্রতি ৮শ টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। একই সাথে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্ম এলাকায় ৪০ হাজার 'করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা' শীর্ষক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এছাড়া সংস্থার "কিশোর-কিশোরী" কর্মসূচির আওতায় কাঠালবাড়িয়া কিশোরী ক্লাব, ঈশ্বরদী এবং শিক্ষাছোঁয়া কিশোরী ক্লাব, কাশীনাথপুর-এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ২৬ হাজার টাকার খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

১০ হাজার ৬শ' পরিবারে প্রত্যাশীর ত্রাণ বিতরণ

সাত জেলায় ১০ হাজার ৬০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে স্বেচ্ছাসেবী সমাজ উন্নয়ন সংগঠন প্রত্যাশী। প্রত্যাশী'র সংগঠিত সদস্য ছাড়াও এলাকার অসহায় হতদরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পরিবার প্রতি ১০ কেজি চাল, ৫ কেজি আলু, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ২ কেজি মসুর ডাল, ২ কেজি পেঁয়াজ ও ২ কেজি ডাল বিতরণ করা হয়। এছাড়াও প্রত্যাশী'র প্রায় ১৩০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর ১ দিনের বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়।

২০ এপ্রিল ২০২০ বোয়ালখালী উপজেলার ৯০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণের মাধ্যমে কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশী'র নির্বাহী পরিচালক মনোয়ারা বেগম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এস.এম. সেলিম, প্রত্যাশী'র পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) মো.নাছিম হায়দার শাহিন, পরিচালক (প্রোগ্রাম) সৈয়দ শহীদ উদ্দিন, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) দ্বিপ্লু বড়ুয়াসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ।

এছাড়া চন্দনাইশ উপজেলায় কৃষকদের উৎপাদিত সব্জি বাজারজাত করার বিষয়টি চিন্তা করে তারা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য সরাসরি মাঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের সবজি ক্রয় করে ৩০০ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশী'র নির্বাহী পরিচালক মনোয়ারা বেগম, বরকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান, প্রত্যাশী'র পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) মো. নাছিম হায়দার শাহিনসহ সংস্থার স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ।

একই সাথে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এবং ইউকেএইডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Let Youth Behave Well (LYBW) প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার বটতলী ও জুইদন্ডী ইউনিয়নের ২৭০টি পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, তেল, আলু , হ্যান্ডওয়াশ, মাস্ক, সাবান ও সবজি

বীজ বিতরণ করা হয়। উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশীর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মনোয়ারা বেগম, বটতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রত্যাশীর পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) নাছিম হায়দার শাহিন, সহকারী পরিচালক দ্বিপ্লু বড়ুয়া, এরিয়া ম্যানেজার শহিদুল ইসলামসহ সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

অমৃতকুন্ডা। পাবনা'র চাটমোহর থানার কুটির শিল্প নির্ভর একটি গ্রাম। স্বরসতী রানী এ গ্রামের পুত্রবধু। বুরো বাংলাদেশের সদস্য শাশুরী সন্ধ্যা রানী'র সাথে তৈরি করেন বাঁশ-বেতের চমৎকার সব পণ্য–মনোমুগ্ধকর নকশায়, পোক্ত বাঁধাইয়ে। ফলে খুব সহজেই আকৃষ্ট হন দেশী-বিদেশী উভয়েই। এ কারণেই তাদের তৈরি পণ্যের অধিকাংশই চলে যায় বিদেশী বাজারে। আসে অর্থ, চলে সংসার। নিজ হাতে তৈরি করা পণ্য যখন প্রশংসা ও অর্থ দু'টোই এনে দেয় তখন শিল্পীর মুখে হাসি তো থাকবেই! বুরো বাংলাদেশও চায় এভাবেই হাসি ফুটুক এদেশের স্বরসতীদের মুখে।

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত খোশনবীশ

এপ্রিল-জুন ২০২০ • সংখ্যা-২১ • বর্ষ-৫